চতুর্থ অধ্যায়

তওবা

প্রকাশ থাকে যে, গোনাহ থেকে তওবা করে আল্লাহ তা'আলার দিকে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে আধ্যাত্ম পথের সূচনা এবং ওলীগণের অমূল্য সম্পদ। সাধকগণ প্রথমে এ পথেই পা বাড়ান। যারা সত্য পথ থেকে বিচ্যুত, তাদের জন্যে এ প্রত্যাবর্তনই হচ্ছে সৎপথে অটল থাকার চাবিকাঠি। নৈকট্যশীলদের জন্যে এটাই আল্লাহর মনোনয়ন লাভের দিকচক্রবাল। পয়গম্বরগণের জন্যে বিশেষত আমাদের আদি পিতা আদম (আঃ)-এর জন্যে এটাই সৌভাগ্য লাভের উৎস।

মানুষ আদম সন্তান বিধায় তার তরফ থেকে গোনাহ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যদি পিতা ক্ষতিপূরণ করে থাকে এবং দোষ সংশোধনে আত্মনিয়োগ করে থাকে, তবে পুত্রেরও উচিত উভয় বিষয়ে পিতার অনুরূপ হওয়া।

এখন হযরত আদম (আঃ)-এর অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যায়, তিনি আল্লাহ তা'আলার নাফরমানীর পর অনুশোচনার দাবানলে দগ্ধীভূত হয়েছেন এবং সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত লজ্জাশ্রু প্রবাহিত করেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, যদি কোন ব্যক্তি কেবল নাফরমানী করার ব্যাপারে তাঁকে আপন পথপ্রদর্শক ও অনুসৃত মনে করে এবং তওবার ধারে-কাছেও না যায়, তবে সে নিতান্তই ভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ট। বরং মূল কথা হচ্ছে কেবল কল্যাণকর্মে আত্মনিবেদিত হওয়া নৈকট্যশীল ফেরেশতাগণের বৈশিষ্ট্য আর শুধু অকল্যাণের দাস হয়ে থাকা শয়তানের স্বভাব। বস্তুত অকল্যাণে জড়িয়ে পড়ার পর কল্যাণের দিকে ফিরে আসা মানুষের ধর্ম। কারণ, মানুষের মজ্জায় কল্যাণ ও অকল্যাণ উভয় বিষয়ের সংমিশ্রণ রয়েছে। যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে ফিরে এসে অকল্যাণের ক্ষতিপূরণ করে নেয়, বাস্তবে সে-ই

মানুষ। যদি সে গোনাহ করার পর তওবা করে, তবে তার আদম সন্তান হওয়ার প্রমাণ শক্তিশালী হয়। পক্ষান্তরে যদি সে গোনাহ ও নাফরমানীর উপর অটল থাকে, তবে সে শয়তানের সাথে আপন বংশগত সম্পর্ক স্থাপনে সচেষ্ট হয়। আর শুধু সৎকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে ফেরেশতার সাথে সম্পর্কযুক্ত হওয়া মানুষের জন্যে সম্ভবপর নয়। কেননা, তার খমীর তথা মৌলিক উপাদানের মধ্যে পাপ-পুণ্য এমন শক্তভাবে মিশ্রিত রয়েছে যে, তার আলাদা হওয়া দু'উপায়েই সম্ভবপর— অনুতাপের উত্তাপ দ্বারা অথবা দোযখের আগুন দ্বারা। বলা বাহুল্য, দোযখের আগুন সহ্য করার তুলনায় দুনিয়াতে অনুতাপের অনলে দগ্ধ হওয়া মানুষের জন্যে সহজতর। সুতরাং গোনাহ করার পর মানুষের উচিত দ্রুত তওবার দ্বারস্থ হওয়া। নতুবা মৃত্যুর পর এ সুযোগ হাতছাড়া হয়ে যাবে।

শরীয়তে তওবার এই গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এর স্বরূপ, সময়কাল, শর্ত, কারণ, লক্ষণ, ফলাফল, বাধাবিপত্তি ইত্যাদি বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা জরুরী। নিম্নে চারটি পরিচ্ছেদে এ বিষয়গুলো বর্ণনা করা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

তওবার স্বরূপ

জানা উচিত যে, তিনটি ধারাবাহিক বিষয়ের সমন্বয়ে তওবা অস্তিত্ব লাভ করে। এক— জ্ঞান, দুই— অনুশোচনা এবং তিন— বর্তমানে ও ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করা এবং অতীত দিনসমূহের ক্ষতিপূরণ করে নেয়া। এই তিন বিষয়ের সমষ্টিকে পরিভাষায় তওবা বলা হয়। প্রায়শ কেবল অনুশোচনাকেই তওবা বলা হয়। আর জ্ঞানকে তার ভূমিকা এবং গোনাহ বর্জনকে ফলাফল আখ্যা দেয়া হয়। এদিক দিয়েই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন اَلنَّدَامَةُ تَوْبَةٌ — অনুশোচনা হচ্ছে তওবা। কেননা, অনুশোচনার অবশ্যই কোন কারণ থাকবে এবং পরবর্তীতে এর কিছু ফলাফলও প্রকাশ পাবে। সুতরাং অনুশোচনা যা মধ্যবর্তী বিষয় ছিল, তাই আপন কারণ ও ঘটনার স্থলাভিষিক্ত হয়ে গেল। এদিক দিয়েই জনৈক বুযুর্গ তওবার সংজ্ঞায় বলেন ঃ তওবা হচ্ছে সাবেক গোনাহের জন্যে অনুশোচনার অনলে অন্তরের বিগলিত হওয়া। এ সংজ্ঞায় কেবল মর্মবেদনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই মর্মবেদনার পরিষ্কার উল্লেখ করে বলেছেন যে, তওবা একটি অগ্নি, যা অন্তরে প্রজ্বলিত হয় এবং একটি বেদনা, যা অন্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় না। কেউ কেউ গোনাহ বর্জনের দিকে লক্ষ্য করে বলেছেন, তওবা হচ্ছে অনাচারের পোশাক খুলে ফেলে সরলতা ও হৃদ্যতার শয্যা পাতা। সহল ইবনে আবদুল্লাহ তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ নিন্দনীয় কর্মকাণ্ডকে প্রশংসনীয় কর্মকাণ্ডে বদলে দেয়ার নাম তওবা। এটা নির্জনবাস, মৌনতা ও হালাল ভক্ষণ ছাড়া সহজলভ্য নয়। সম্ভবত এ সংজ্ঞায় তৃতীয় বিষয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

তওবার প্রথম বিষয় জ্ঞানের উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা জানা যে, গোনাহের ক্ষতি অসামান্য এবং অনেক গোনাহ মানুষ ও তার প্রেমাস্পদ আল্লাহর মধ্যে আড়াল হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই জ্ঞানের ফলস্বরূপ অন্তরে অনুশোচনার উৎপত্তি হয়।

তওবার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আরও অনেক উক্তি বর্ণিত আছে। আমাদের বর্ণিত উপরোক্ত তিনটি বিষয় সম্যক জেনে নেয়ার পর এটা কঠিন হবে না যে, অন্যরা তওবার সংজ্ঞা প্রসঙ্গে যা কিছু বলেছে, তার কোনটিতেই উপরোক্ত তিনটি বিষয় এক সাথে পাওয়া যায় না। অথচ তওবার বাস্তব স্বরূপ জানাই উদ্দেশ্য— শব্দ নয়।

তওবার ফযীলত ও আবশ্যকতা ঃ কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা তওবার আবশ্যকতা প্রমাণিত। যার অন্তশ্চক্ষু উন্মুক্ত এবং যার বক্ষ ঈমানের আলোকে আলোকিত, তার কাছেও এর প্রয়োজনীয়তা সুস্পষ্ট। এরূপ ব্যক্তি অজ্ঞতার অন্ধকারের মধ্যেও এই আলোকের সাহায্যে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারে। প্রতি পদক্ষেপে একজন পথপ্রদর্শক সঙ্গে থাকা তার জন্য জরুরী নয়। যারা আল্লাহর পথে চলে, তাদের কেউ কেউ অন্ধ হয়ে থাকে। কারও সাহায্য ব্যতিরেকে সম্মুখে পা বাড়াতে পারে না। আবার কেউ কেউ চক্ষুষ্মান হয়ে থাকে। একবার পথে পা রাখলে আপনা-আপনিই অগ্রসর হতে থাকে। প্রথম প্রকার লোক ধর্মের পথে প্রতি পদক্ষেপে কোরআনের আয়াত অথবা হাদীস শুনার মুখাপেক্ষী হয়। পরিষ্কার আয়াত অথবা হাদীস পাওয়া কঠিন হলে মাঝে মাঝে তারা হতভম্ব হয়ে পড়ে। কঠোর পরিশ্রম করা এবং দীর্ঘায়ু লাভ করা সত্ত্বেও তাদের ভ্রমণ সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে এবং পদক্ষেপও ছোট হয়। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় প্রকার লোকের বক্ষ আল্লাহ তা'আলা দ্বীনের জন্য উন্মুক্ত করে দেন বিধায় তারা সামান্য ইঙ্গিত পেয়েই কঠিন কঠিন পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। তারা কোরআন পাকের এই আয়াতের অনুরূপ—

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيْءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ

অর্থাৎ, আগুনের ছোঁয়া না পেয়েও তার তৈল যেন জ্বলতে থাকে।

অর্থাৎ, সামান্য ইঙ্গিতই তাদের জন্যে যথেষ্ট হয়। আর পূর্ণরূপে বলে দেয়ার পর তাদের অবস্থা এই দাঁড়ায়—

نُورٌ عَلٰى نُورٍ يَهْدِى اللّٰهُ لِنُورِهٖ مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ, আলোর উপর আলো। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা, তাঁর আলোর পথ দেখান।

এরূপ লোকদের জন্যে প্রতিক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসের প্রয়োজন নেই। তারা তওবার আবশ্যকতা জানতে চাইলে প্রথমে অন্তশ্চক্ষুর আলোকে তওবা কি তা দেখে, অতঃপর আবশ্যকতার অর্থ বুঝে, এরপর উভয়টিকে মিলিয়ে জেনে নেয় যে, তওবার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণিত। উদাহরণতঃ তারা প্রথমে জানে যে, ওয়াজিব ও জরুরী তাই, যা চিরন্তন সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছা এবং চিরন্তন ধ্বংস থেকে আত্মরক্ষার জন্যে জরুরী। এরপর তারা বুঝে যে, কিয়ামতে আল্লাহর দীদার ব্যতীত কোন সৌভাগ্য নেই। যে এ থেকে বঞ্চিত হয়, সে হতভাগ্য। এতটুকু জানার পর তাদের কোন সন্দেহ থাকে না যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার জন্যে সেই পথ থেকে ফিরে আসতে হবে, যে পথ আল্লাহ থেকে দূরে নিয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই পথ থেকে ফিরে আসা তিনটি বিষয় দ্বারা অর্জিত হবে— জ্ঞান, অনুশোচনা ও সংকল্প। কেননা, যে পর্যন্ত এ বিষয়ের জ্ঞান না হবে যে, গোনাহ আল্লাহ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণ, সে পর্যন্ত অনুশোচনা হবে না। আর অনুশোচনা না হওয়া পর্যন্ত ফিরে আসার প্রশ্নই উঠে না। যে ব্যক্তি ঈমানের আলোকে আলোকিত, তার তওবা এভাবেই হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই স্তরে উন্নীত নয়, তার জন্য তাকলীদ ও অনুসরণের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে। সে অনুসরণের মাধ্যমে ধ্বংসের কবল থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এখন এই তওবা সম্পর্কে আল্লাহ পাক, রসূলে করীম (সাঃ) ও পূর্ববর্তী মনীষীগণের উক্তি প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সম্মিলিতভাবে আল্লাহর সামনে তওবা কর—যাতে সফলকাম হও।

এখানে সকল ঈমানদারকে তওবা করার ব্যাপক আদেশ করা হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا

অর্থাৎ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো শুন, তোমরা আল্লাহর সামনে পরিষ্কার মনে তওবা কর।

এ আয়াতে "নাসূহ" শব্দ ব্যবহার করে বুঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর জন্যে খাঁটি ও অবিমিশ্র তওবা কর।

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

অর্থাৎ, আল্লাহ ভালবাসেন তওবাকারীকে এবং ভালবাসেন পবিত্রতা অবলম্বনকারীকে।

এ আয়াতটি তওবার ফযীলত জ্ঞাপন করে।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ التَّائِبُ حَبِيبُ اللَّهِ অর্থাৎ, তওবাকারী আল্লাহর প্রিয়জন। التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ অর্থাৎ, যে গোনাহ থেকে তওবা করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই।

এক হাদীসে দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা হয়েছে—এক ব্যক্তি সফর করতে করতে এক প্রতিকূল জায়গায় বিশ্রামের জন্যে যাত্রা বিরতি করল। সঙ্গে তার পাথেয় বহনকারী উট। লোকটি মাটিতে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর জাগ্রত হয়ে দেখল তার উটটি নেই। সে ক্ষোভে ও দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়ে উটটিকে খুঁজতে লাগল। অবশেষে যখন রৌদ্রতাপ, পিপাসা ও ক্ষুধায় কাতর হয়ে পড়ল, তখন মনে মনে বলল ঃ আমি যেখানে ছিলাম, সেখানেই চলে যাব এবং মৃত্যুর অপেক্ষায় শুয়ে থাকব। সেমতে সেখানে পৌঁছে মাথার উপর হাত রেখে শুয়ে পড়ল এবং তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর চোখ খুলতেই দেখল পাথেয় বহনকারী উটটি শিয়রের কাছেই দাঁড়িয়ে আছে। উটটি ফিরে পাওয়ার কারণে এই ব্যক্তির যে আনন্দ হতে পারে, তার চেয়ে অনেক বেশী আল্লাহ তা'আলা মুমিন বান্দার তওবার কারণে আনন্দিত হন।

হযরত হাসান (রহঃ) বর্ণনা করেন, আল্লাহ তা'আলা হযরত আদম (আঃ)-এর তওবা কবুল করলে পর ফেরেশতারা তাকে মোবারকবাদ দিল। হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁর কাছে এসে বললেন ঃ হে আদম, আল্লাহ

তা'আলা আপনার তওবা কবুল করায় আপনার কলিজা ঠাণ্ডা হয়েছে নিশ্চয়? হযরত আদম (আঃ) জওয়াব দিলেন ঃ জিবরাঈল, যদি তওবা কবুল করার পরও আমাকে সওয়াল করা হয়, তবে আমার ঠিকানা কোথায় হবে? তখনই তাঁর প্রতি ওহী আগমন করল— হে আদম, তুমি তোমার সন্তানদের জন্যে দুঃখকষ্টও রেখে গেলে এবং তওবাও। অতএব, তাদের মধ্যে যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দেব, যেমন তোমার ডাকে সাড়া দিয়েছি। আর যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি কৃপণতা করব না। কেননা, আমার নাম "করীব" (নিকটবর্তী) এবং "মুজীব" (সাড়া দানকারী)। হে আদম, আমি তওবাকারীদেরকে কবর থেকে যখন উত্থিত করব, তখন তারা আসতে থাকবে এবং সুসংবাদ শুনতে থাকবে। তারা যে দোয়া করবে, তা কবুল হবে।

মোটকথা, তওবার সংজ্ঞা হচ্ছে বর্তমানে গোনাহ পরিত্যাগ করা এবং ভবিষ্যতে তা না করার জন্যে সংকল্পবদ্ধ হওয়া, সাথে সাথে অতীতের ত্রুটি-বিচ্যুতি পূরণ করে নেয়া। এই তওবা তাৎক্ষণিকভাবে ওয়াজিব। কেননা, গোনাহকে ক্ষতিকর মনে করা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে ব্যক্তি গোনাহ পরিত্যাগ করে না, তার মধ্যে ঈমানের এই অংশটি অনুপস্থিত। নিম্নোক্ত হাদীসে এ কথাই বুঝানো হয়েছে—

لَا يَزْنِى الزَّانِى حِيْنَ يَزْنِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ

অর্থাৎ, যিনাকার ব্যক্তি যখন যিনা করতে থাকে, তখন সে ঈমানদার থাকে না।

অর্থাৎ যিনা যে আল্লাহর অসন্তোষ সৃষ্টিকারী একটি গোনাহ, এ বিষয়ের ঈমান যিনাকারের মধ্যে থাকে না। এর অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে মূল ঈমানই থাকে না; অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার করা। অতএব বুঝা গেল, আল্লাহকে জানা, তাঁর একত্ব স্বীকার করা, তাঁর গুণাবলী, ঐশী গ্রন্থসমূহ এবং রসূলগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যিনার পরিপন্থী নয়। তাই যিনার কারণে এই ঈমান বিনষ্ট হবে না। উদাহরণতঃ কোন চিকিৎসক রোগীকে বলল ঃ এটা বিষ। এটা খেয়ো না। যদি রোগী সেই বস্তু খেয়ে ফেলে, তবে

বলা হবে যে, সে চিকিৎসকের এ কথাটির সত্যতা স্বীকার করে না এবং এর অর্থ এই হবে না যে, সে চিকিৎসকের অস্তিত্ব এবং তার চিকিৎসক হওয়া বিশ্বাস করে না। এ থেকে জানা গেল যে, গোনাহগার ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানদার হয় না এবং ঈমান একই বস্তু বিশ্বাস করার নাম হয় না; বরং এর সত্তরের উপর শাখা রয়েছে। তন্মধ্যে সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে কালেমা তাইয়েবার সাক্ষ্য দেয়া এবং নিম্নতম শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে ক্ষতিকর বস্তু সরিয়ে দেয়া।

ঈমানের সঠিক দৃষ্টান্ত হচ্ছে মানুষ। আত্মার অনুপস্থিতিতে যেমন মানুষ মানুষ হয় না, তেমনি একত্ববাদ স্বীকার না করলে ঈমান ঈমান হয় না। যে ব্যক্তি কেবল তাওহীদ ও রেসালতের সাক্ষ্য দেয় এবং আমলে ত্রুটি করে, সে এমন মানুষের মত, যার হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ ইত্যাদি বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই। এরূপ মানুষের মৃত্যু যেমন অতি নিকটে, তেমনি যে ব্যক্তি কেবল কালেমা তাইয়েবা ও রেসালতের সাক্ষ্য দেয়, সেও এই অবস্থার কাছাকাছি। সামান্য ঝড়ো হাওয়ায় তার ঈমানের বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত হয়ে যায়। অর্থাৎ মৃত্যুদূতের আগমনের সময় যে ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তার কারণে ঈমান উধাও হয়ে যায়। দুর্বল ঈমান এই পরিস্থিতি বরদাশত করতে পারে না। এরূপ মুমিনের "খাতেমা" তথা জীবনাবসান শুভ না হওয়ার আশংকা থাকে। খাতেমার সময় সেই ঈমানই বাকী থাকে, যার ভিত্তি সার্বক্ষণিক আনুগত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে। কোন কোন গোনাহগার ব্যক্তি আনুগত্যশীল ব্যক্তিকে বলে, আমার মধ্যে ও তোমার মধ্যে পার্থক্য কি? তুমিও ঈমানদার, আমিও ঈমানদার। যেমন লাউগাছ দেবদারু গাছকে বলেছিল, আমিও বৃক্ষ, তুমিও বৃক্ষ। কাজেই আমাদের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। কিন্তু জওয়াবে দেবদারু গাছ বলেছিল, নামের অভিন্নতার এই বিভ্রান্তি তোমার তখন দূর হবে, যখন কালবৈশাখীর ঝড় আসবে। তখন তোমার শিকড় উপড়ে যাবে এবং পাতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। আর আমি পূর্ববৎ সগর্বে দাঁড়িয়ে থাকব।

সুতরাং গোনাহগার ব্যক্তি যদি দোযখ বাসকে ভয় না করে এবং মৃত্যুর পরওয়া না করে, তবে তাকে বলা হবে দেখ, সুস্থ-সবল ব্যক্তি অসুখ-বিসুখের আশংকা করে এবং যখন অসুস্থ হয়ে যায়, তখন মৃত্যুকে

ভয় করে। এমনিভাবে গোনাহগারেরও উচিত অশুভ খাতেমাকে ভয় করা। যদি খোদা না করুন, খাতেমা খারাপ হয়, তবে দোযখের অগ্নিতে থাকা জরুরী। কেননা, ঈমানের জন্যে গোনাহ তেমনি, যেমন দেহের জন্যে ক্ষতিকর খাদ্য। ক্ষতিকর খাদ্য পাকস্থলীতে একত্রিত হয়ে আস্তে আস্তে পিত্তাদির মেযাজ বিগড়াতে থাকে, যা মানুষ টের পায় না। এরপর হঠাৎ সে রুগ্ন হয়ে পড়ে এবং মৃত্যুবরণ করে। গোনাহ ঈমানের মধ্যে এমনিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং একদিন ঈমানকেই ডুবিয়ে দেয়। সুতরাং ধ্বংসশীল দুনিয়াতে মৃত্যুর ভয়ে যখন বিষাক্ত ও ক্ষতিকর খাদ্য না খাওয়া তাৎক্ষণিক ওয়াজিব, তখন চিরন্তন ধ্বংসের ভয়ে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম না করা আরও উত্তমরূপে তাৎক্ষণিক ওয়াজিব হবে। বিষপানকারী স্বীয় ভুলের জন্যে অনুতপ্ত হয়ে যেমন তৎক্ষণাৎ উদরকে বিষমুক্ত করার জন্যে বমি করতে অথবা অন্য কোন উপায় অবলম্বন করতে সচেষ্ট হয়, তেমনিভাবে যে গোনাহ করে, তার জন্যে গোনাহ থেকে তৎক্ষণাৎ ফিরে আসা ওয়াজিব। এরপর যতদিন সে জীবিত থাকে, ততদিন এই ক্ষতিপূরণ করতে সচেষ্ট হবে। সুতরাং গোনাহগারের উচিত দ্রুত তওবার প্রতি মনোনিবেশ করা। নতুবা গোনাহের বিষক্রিয়ার ফলে ঈমানের আত্মা প্রভাবিত হয়ে যাবে। এরপর ওয়ায-নসীহত কোন উপকারে আসবে না এবং গোনাহগার ব্যক্তি ধ্বংসপ্রাপ্তদের তালিকাভুক্ত হয়ে নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতীক হয়ে যাবে—

إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ - وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ○

অর্থাৎ, আমি তাদের গলদেশে চিবুক পর্যন্ত বেড়ি পরিয়েছি, ফলে তারা উর্ধ্বমুখী হয়ে গেছে। আমি তাদের সামনে ও পেছনে প্রাচীর স্থাপন করেছি এবং তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে দিয়েছি। ফলে, তারা দেখতে পায় না। আপনি তাদেরকে সতর্ক করুন বা না করুন, তারা ঈমান আনবে না।

এ আয়াতগুলো কাফেরদের সম্পর্কে বলা হয়েছে— এরূপ মনে করে বিভ্রান্ত হওয়া ঠিক নয়। কেননা, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ঈমানের শাখা সত্তরেরও বেশী এবং যিনাকার মুমিন অবস্থায় যিনা করে না। এ থেকে জানা যায়, যে ব্যক্তি শাখার অনুরূপ ঈমান থেকে বঞ্চিত হবে, সে খাতেমার সময় মূল ঈমান থেকেও বঞ্চিত হবে, যেমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যা আত্মার শাখা, তা না থাকলে মানুষের মূল আত্মাও বিলুপ্ত হয়ে যায়। কেননা, শাখা ব্যতীত মূল কায়েম থাকতে পারে না।

প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে তওবা অপরিহার্য ঃ সকলের জন্যে তওবার অপরিহার্যতা নিম্নোক্ত আয়াত দ্বারা প্রমাণিত ঃ

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর, যাতে সফলকাম হও।

এ আয়াতে ব্যাপকভাবে সম্বোধন করা হয়েছে। বুদ্ধি-বিবেকের আলোকেও এই অপরিহার্যতা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কেননা, তওবার অর্থ হচ্ছে, যে পথ আল্লাহ থেকে দূরে এবং শয়তানের কাছে, সে পথ থেকে ফিরে আসা উচিত। এই ফিরে আসার কাজটি বুদ্ধিমান ব্যক্তি দ্বারাই সম্ভবপর। কাম, ক্রোধ ও অন্যান্য নিন্দনীয় স্বভাব হচ্ছে মানুষকে বিপথগামী করার জন্যে শয়তানের হাতিয়ার। এগুলো যখন পূর্ণতা লাভ করে, তখন মানুষের বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে। সাধারণত চল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ হয়ে থাকে এবং তার ভিত্তি যৌবনে পা রাখার সাথে সাথে পূর্ণ হয়ে যায়। এ ভিত্তির সূচনা হয় সাত বছর বয়স থেকে। কিন্তু কাম ও ক্রোধ পূর্ব থেকেই বিদ্যমান থাকে। এগুলো হচ্ছে শয়তানের বাহিনী এবং বুদ্ধি ফেরেশতাদের বাহিনী। যখন উভয় বাহিনী মুখোমুখি হয়, তখন তাদের মধ্যে যুদ্ধ অবশ্যই সংঘটিত হয়। কেননা, এরা পরস্পর বিরোধী শক্তি। একের উপস্থিতিতে অন্যের কায়েম থাকা সম্ভব নয়। যেমন রাত ও দিন এবং অন্ধকার ও আলো একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এ যুদ্ধে যে পক্ষ বিজয়ী হয়, সে অপর পক্ষের মূলোচ্ছেদ করে। কাম ও ক্রোধ শৈশবেই পূর্ণাঙ্গ হয়ে যায় বিধায় শয়তানের ব্যূহ বুদ্ধির পূর্বেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

তাই স্বভাবতই কামনার দাবীর প্রতি মানুষের টান ও মোহ প্রবল হয়ে উঠে এবং এ থেকে উদ্ধার পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এরপর যখন বুদ্ধি প্রকাশ পায়, তখন যদি তা শক্তিশালী ও পূর্ণাঙ্গ না হয়, তবে যুদ্ধের ময়দান শয়তানের হাতেই থাকে এবং সে কোরআনে উল্লিখিত এই প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে নেয়ঃ

لَاحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا

অর্থাৎ, আমি আদম সন্তানদেরকে অল্পসংখ্যক বাদে অবশ্যই বিপথগামী করব।

পক্ষান্তরে যদি বুদ্ধি পূর্ণাঙ্গ ও শক্তিশালী হয়, তবে প্রথমে সে শয়তান বাহিনীর মূলোচ্ছেদ করতে শুরু করে। এ জন্যে কামনাকে চূর্ণ করে, অভ্যাস ত্যাগ করে এবং মনকে বলপূর্বক এবাদতে ফিরিয়ে আনে। বলা বাহুল্য, তওবার উদ্দেশ্য তাই। অর্থাৎ, ফিরে আসার কাজটি এখানেও পাওয়া যায়। যেহেতু কাম বুদ্ধির পূর্বে অস্তিত্ব লাভ করে, তাই যে কাজ বুদ্ধির পূর্বে করা হয়, তা থেকে ফিরে আসা অর্থাৎ তওবা করা প্রত্যেক মানুষের জন্যে অত্যাবশ্যক— সে নবী-রসূল কিংবা সাধারণ মানুষ যেই হোক। কাজেই এরূপ মনে করা উচিত নয় যে, তওবার প্রয়োজন বিশেষভাবে হযরত আদম (আঃ)-এর জন্যেই ছিল; বরং এটা একটা আদি বিধান; যা মানুষ মাত্রের জন্যেই জরুরী। এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়।

অতএব, যে ব্যক্তি বালেগ হয়, সে যদি কুফর ও মূর্খতার উপর থাকে, তবে এসব বিষয় থেকে তওবা করা তার উপর ওয়াজিব। যদি সে পিতামাতার অনুগামী হয়ে মুসলমান হয়, তবে ইসলামের স্বরূপ সম্পর্কে অবশ্যই গাফেল ও অজ্ঞ। এ ক্ষেত্রে এই গাফলতি ও অজ্ঞতা থেকে তওবা করা ওয়াজিব। তাকে ইসলামের সঠিক অর্থ বুঝতে হবে। কেননা, তার পিতামাতার ইসলাম তার জন্যে উপকারী হবে না যে পর্যন্ত নিজে মুসলমান না হবে। ইসলামকে বুঝার পর নিজের অভ্যাস ও কামনা চরিতার্থ করার জন্যে অহেতুক স্বেচ্ছাচারপ্রীতি থেকে ফিরে আসা অপরিহার্য অর্থাৎ, প্রত্যেক করণীয় ও বর্জনীয় কাজে আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত সীমা মেনে চলতে হবে— সীমার বাইরে এক পাও রাখা যাবে না। এ প্রকার তওবা সর্বাধিক কঠিন। অধিকাংশ লোক এতে অক্ষম হয়ে বরবাদ হয়ে যায়।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে জানা গেল যে, তওবা প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে ফরযে আইন। এরূপ কোন ব্যক্তির কল্পনা করা যায় না, যার তওবার প্রয়োজন নেই। হযরত আদম (আঃ) তওবা থেকে বেপরওয়া হতে পারেননি। তেমনি তাঁর সন্তানরাও এ থেকে বেপরওয়া নয়।

এখন জানা দরকার যে, তওবা সর্বদা ও সর্বাবস্থায় ওয়াজিব। কেননা, কোন ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গোনাহ থেকে মুক্ত নয়। পয়গম্বরগণও এ থেকে বাঁচতে পারেননি। কোরআন ও হাদীসে পয়গম্বরগণের ত্রুটি, তাঁদের তওবা ও কান্নাকাটি উল্লেখ রয়েছে। কদাচিৎ মানুষ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলেও মনে মনে গোনাহের কল্পনা থেকে বাঁচতে পারে না। যদি অন্তরেও গোনাহের কল্পনা না থাকে, তবে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত হয় না। সে অন্তরে বিক্ষিপ্ত কল্পনা নিক্ষেপ করতে থাকে। ফলে আল্লাহর এবাদতে গাফলতি দেখা দেয়। যদি কেউ কুমন্ত্রণা থেকেও মুক্ত থাকে, তবে আল্লাহ তা'আলা, তাঁর গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কে যথার্থ ওয়াকিফহাল হওয়ার ব্যাপারে ত্রুটি থেকেই যায়। মোটকথা, ত্রুটিমুক্ততা মানুষের জন্যে কল্পনা করা যায় না। তবে ত্রুটির পরিমাণে মানুষের অবস্থা বিভিন্নরূপ হতে পারে। মূল ত্রুটি প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান রয়েছে। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন—

اِنَّهُ لَيُرَانُ عَلٰى قَلْبِىْ حَتّٰى اَسْتَغْفِرَ اللّٰهَ فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً -

অর্থাৎ, আমার অন্তরে মরিচা ধরে যায়। এমনকি, আমি দিবা-রাত্রিতে সত্তর বার আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

বলা বাহুল্য, এই ক্ষমা প্রার্থনার কারণেই আল্লাহ তাঁকে মাহাত্ম্য দান করেছেন। আল্লাহ বলেন—

لِيَغْفِرَلَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ -

অর্থাৎ, যাতে আল্লাহ আপনার আগের ও পেছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এরই যখন এই অবস্থা, তখন অন্যদের কি দশা হবে।

এই ত্রুটির কারণ পরিত্যাগ করা এবং তার বিপরীত কারণ অবলম্বন করাই তওবার সারকথা।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, অন্তরে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা আসা নিঃসন্দেহে ত্রুটি এবং অন্তর এগুলো থেকে মুক্ত হওয়া পূর্ণতা। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক ত্রুটির কারণ থেকে পূর্ণতার দিকে উন্নতি করাকে তওবা বলা হবে। পূর্বের বর্ণনা অনুযায়ী তওবা ওয়াজিব। অথচ ত্রুটি থেকে পূর্ণতার উন্নতি করা ফযীলত তথা বাড়তি গুণের কাজ, ওয়াজিব নয়। কারণ, পূর্ণতা অর্জন করা ওয়াজিব নয়। এমতাবস্থায় সর্বাবস্থায় তওবা ওয়াজিব হওয়ার মানে কি? এর জওয়াব এই যে, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, মানুষ জন্মলগ্ন থেকে কখনও কামনার অনুসরণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে না এবং কামনা থেকে তওবা করার উদ্দেশ্য এটা নয় যে, কামনার অনুসরণ কেবল ভবিষ্যতে পরিত্যাগ করবে; বরং পূর্ণ তওবা হচ্ছে অতীতকালের ক্ষতিও পূরণ করা। মানুষ যখনই কামনার অনুসরণ করে, তখনই তার অন্তরে এক প্রকার অন্ধকার ছায়াপাত করে; যেমন আয়নায় মুখের বাষ্প লাগলে আয়না মলিন হয়ে যায়। যদি এই কামনার অনুসরণ একের পর এক অব্যাহত থাকে, তবে অন্তরের অন্ধকার মরিচায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। যেমন, মুখের বাষ্প অব্যাহতভাবে আয়নায় পড়তে থাকলে কালক্রমে আয়নায় মরিচা ধরে যায়। কামনার কারণে অন্তরে মরিচা ধরার কথা কোরআনে উল্লিখিত হয়েছে। বলা হয়েছে—

كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ

অর্থাৎ, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে মরিচা ধরিয়ে দিয়েছে।

মরিচা যদি অনেক বেশী হয়, তবে অন্তরে মোহর লেগে যায়। যেমন আয়নার মরিচা অনেকদিন পরিষ্কার না করলে তা আর পরিষ্কার করার যোগ্য থাকে না। তখন মনে হয় যেন আয়নাটি মরিচা দ্বারাই নির্মিত হয়েছে। সুতরাং আয়না পরিষ্কার করার জন্যে যেমন ভবিষ্যতে বাষ্প ও ময়লা পড়তে না দেয়াই যথেষ্ট নয়; বরং চেহারা দেখার জন্যে পূর্বের বাষ্প ও ময়লা দূর করা জরুরী, তেমনিভাবে অন্তর পরিষ্কার করার জন্যেও ভবিষ্যতে কামনার অনুসরণ ত্যাগ করা যথেষ্ট নয়; বরং অতীত গোনাহের

কারণে অন্তরে যে অন্ধকার ছেয়ে গেছে, তাও দূর করা জরুরী। গোনাহের কারণে যেমন অন্তরে অন্ধকার নেমে আসে, তেমনি এবাদত ও কামনা বর্জনের কারণে নূর সৃষ্টি হয়, যার ফলস্বরূপ সেই অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এক হাদীসে এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে—

اَتْبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا

অর্থাৎ, অসৎ কর্মের পেছনে সৎকর্ম কর। সৎকর্ম অসৎ কর্মকে মিটিয়ে দেয়।

এ থেকে জানা গেল যে, সর্বাবস্থায় অন্তর থেকে গোনাহের চিহ্ন মিটিয়ে ফেলার প্রয়োজন রয়েছে। এখন সর্বাবস্থায় তওবা ওয়াজিব হওয়ার অর্থ কি, তা জানা দরকার।

প্রকাশ থাকে যে, ওয়াজিবের অর্থ দ্বিবিধ। এক ওয়াজিব শরীয়তের বিধিবিধানে সুবিদিত। এতে সকলেই শরীক। যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি। পূর্ণতার স্তর এই ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত নয়। দ্বিতীয় ওয়াজিব আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করার জন্যে জরুরী। আমরা এতক্ষণ যে সব বিষয় থেকে তওবা করার কথা লিখেছি, সেগুলো সমস্তই এই নৈকট্যের স্তরে পৌঁছার জন্যে জরুরী। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝা দরকার। আমরা বলি, নফল নামাযের জন্যে উযু ওয়াজিব। এর অর্থ এই যে, যে ব্যক্তি নফল নামায পড়তে চায়, তার জন্যে উযু জরুরী। কিন্তু যে ব্যক্তি নফলই পড়তে চায় না, তার জন্যে নফলের কারণে উযু ওয়াজিব নয়। অথবা আমরা বলি, চক্ষু, কর্ণ, হাত, পা মানুষের অস্তিত্বের জন্যে শর্ত ও জরুরী। অর্থাৎ, যদি কেউ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হতে চায়, তবে তার জন্যে এসব অঙ্গ থাকা অত্যাবশ্যক। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি কেবল মাংসপিণ্ডের জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, তবে এরূপ জীবনের এসব অঙ্গ থাকা জরুরী নয়। সুতরাং শরীয়তের যেসব মূল ওয়াজিব সকলের উপর ওয়াজিব, তা দ্বারা কেবল নাজাত তথা মুক্তি পাওয়া যায়। নিরেট মুক্তিকে কেবল মাংসপিন্ডের জীবন মনে করা উচিত। এটি ছাড়া অন্য আরও যেসকল সৌভাগ্য রয়েছে, সেগুলোকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অনুরূপ জ্ঞান করা দরকার। মুক্তির অলংকার ও সাজসজ্জা সেগুলোই। এগুলোর জন্যেই পয়গম্বর, ওলী

ও আলেমগণ আজীবন সাধনা করেছেন এবং পার্থিব সুখ-শান্তি ও আনন্দ পুরোপুরি বিসর্জন দিয়েছেন।

সেমতে হযরত ঈসা (আঃ) একবার মাথার নিচে পাথর রেখে শয়ন করেছিলেন। শয়তান হাযির হয়ে আরয করল ঃ আপনি তো দুনিয়া বর্জন করেছিলেন। এখন এ কি করলেন? তিনি বললেন ঃ তুই দুনিয়া বর্জনের খেলাফ কি দেখলি? শয়তান বলল ঃ পাথরকে বালিশ করা দুনিয়ার সুখ। মাটিতে মাথা রাখেন না কেন? তিনি তৎক্ষণাৎ মাথার নিচ থেকে পাথরটি বের করে ফেলে দিলেন এবং মাটিতে মাথা রেখে শয়ন করলেন। হযরত ঈসা (আঃ) -এর এ কাজটি ছিল দুনিয়ার এ সুখ থেকে তওবা। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি কি জানতেন না যে, মাটিতে মাথা রাখা শরীয়তের সাধারণ বিধানে ওয়াজিব নয়? এমনিভাবে রসূলে করীম (সাঃ) নকশাযুক্ত চাদরকে নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টিকরী পেয়ে খুলে ফেলেছিলেন এবং জুতার নতুন ফিতাকে মনোযোগ আকৃষ্ট করতে দেখে তার স্থলে পুরাতন ফিতা লাগিয়ে নিয়েছিলেন। তার কি জানা ছিল না যে, এসব বিষয় শরীয়তে ওয়াজিব নয়? জানা থাকলে এগুলো বর্জন করলেন কেন? এ থেকে বুঝা গেল যে, তিনি এসব বিষয়কে অন্তরে প্রতিশ্রুত "মকামে মাহমুদ" (প্রশংসিত মর্তবা) পর্যন্ত পৌঁছার পথে কার্যকর অন্তরায় অনুভব করার কারণে বর্জন করেছিলেন। হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রাঃ) দুধ পান করার পর যখন জানতে পারলেন, তা অবৈধ উপায়ে অর্জিত ছিল, তখন কণ্ঠনালীতে অঙ্গুলি ঢুকিয়ে খুব বমি করলেন। ফলে, তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তিনি কি ফেকাহ শাস্ত্রের এই বিধান জানতেন না যে, ভুলক্রমে পান করার মধ্যে গোনাহ নেই এবং পান করা বস্তু পেট থেকে বের করা ওয়াজিব নয়? তা হলে তিনি এই পান করা থেকে রুজু করলেন কেন এবং পেটকে যথাসম্ভব খালি করতে চাইলেন কেন? এর কারণ এটাই ছিল যে, তিনি জানতেন জনসাধারণের বিধান এবং আখেরাত পথের বিপদ ভিন্ন ভিন্ন। অতএব, এ সকল মহাপুরুষের অবস্থা চিন্তা করা দরকার। তাঁরা আল্লাহ, তাঁর পথ, তাঁর শাস্তি এবং গোপন বিভ্রান্তি সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত ছিলেন।

মোটকথা, এসব রহস্য সম্পর্কে অবগত ব্যক্তিরা জানে, আধ্যাত্ম পথে

চলার জন্যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর প্রতি মুহূর্তে নির্ভেজাল তওবা করা ওয়াজিব। নূহ (আঃ)-এর মত দীর্ঘজীবী হলেও তৎক্ষণাৎ ও অবিলম্বে তওবা করবে। আবূ সোলায়মান দারানী বলেন ঃ যদি বুদ্ধিমান ব্যক্তি অবশিষ্ট জীবন কেবল এজন্যে দুঃখ করে যে, তার অতীত জীবন এবাদত ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে গেছে, তবে আমৃত্যু এ দুঃখ তার জন্যে সমীচীন হবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি অবশিষ্ট জীবনও অতীত জীবনের ন্যায় কুকর্মে অতিবাহিত করে, তবে তার কি অবস্থা হবে? বুদ্ধিমান ব্যক্তি যদি কোন সুবর্ণ সুযোগ পায়, এরপর তা অহেতুক বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে এজন্যে সে অবশ্যই দুঃখ করে। আর যদি সেই সুযোগ বিনষ্ট হওয়ার সাথে সাথে স্বয়ং ব্যক্তিরও ধ্বংস অনিবার্য হয়, তবে দুঃখ আরও বেশী হবে।

মানুষের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ, যার কোন বিকল্প নেই। কারণ, এতে মানুষ নিজের চিরন্তন সৌভাগ্য গড়ে নিতে পারে এবং সার্বক্ষণিক দুর্ভাগ্য থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এরপর মানুষ যদি এই সুযোগ হেলায় নষ্ট করে দেয়, তবে সেটা খুবই ক্ষতির বিষয় হবে। আর যদি এই সুযোগকে আল্লাহর নাফরমানীতে বিনষ্ট করে, তবে সরাসরি নিজের ধ্বংসই ডেকে আনে। এরপরও যদি মানুষ এই বিপদের জন্যে দুঃখ না করে, তবে এটা হবে মূর্খতা, যা সকল বিপদের মধ্যে বৃহত্তম বিপদ। কিন্তু মূর্খতার বিপদ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি জানতে পারে না। কেননা, গাফলতির স্বপ্ন তার মধ্যে ও তার জ্ঞানের মধ্যে অন্তরায় হয়ে যায়। পরিতাপের বিষয়, সকল মানুষই এই গাফলতির স্বপ্নে বিভোর। যখন মৃত্যু আসবে, তখন স্বপ্নভঙ্গ হবে। তখন বিপদগ্রস্ত ব্যক্তি তার বিপদ টের পাবে। কিন্তু তখন ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। বেদনা ও নৈরাশ্য ছাড়া কিছুই পাওয়া যাবে না।

জনৈক সাধক বলেন ঃ মালাকুল মওত যখন কোন মানুষের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলে দেয়, তোমার জীবন আর মাত্র এক মুহূর্ত বাকী, এতে এক নিমেষেরও বিলম্ব হবে না, তখন সে এত দুঃখিত ও অনুতপ্ত হয় যে, এক মুহূর্ত সময় পাওয়ার জন্যে যদি সে সমগ্র পৃথিবীর মালিক হত, তবে তাও অকাতরে দিয়ে দিত, যাতে সে সেই বাড়তি মুহূর্তের মধ্যে নিজের দোষক্রটির ক্ষতিপূরণ করে নেয়। কিন্তু তখন অবকাশ কোথায়। কোরআন পাকের নিম্নোক্ত আয়াতে এ বিষয়বস্তুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে—

مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِىَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْ لَا اَخَّرْتَنِىْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ فَاَصَّدَّقَ وَاَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَآءَ اَجَلُهَا -

অর্থাৎ, তোমাদের কারও কাছে মৃত্যু আসার পূর্বে সে বলে, পরওয়ারদেগার! আমাকে সামান্য সময় অবকাশ দিলে না কেন, যাতে আমি দান-খয়রাত করতাম এবং সৎকর্মীদের একজন হতাম। আল্লাহ কখনও অবকাশ দিবেন না কাউকে যখন তার মৃত্যু এসে পড়বে।

সামান্য সময়ের অর্থ হল মানুষের সামনে মালাকুল মওতের আবির্ভাব। তখন মানুষ বলে ঃ হে মালাকুল মওত, আমাকে একদিনের সময় দাও, যাতে আমি পরওয়ারদেগারের কাছে ক্ষমা চাই এবং তওবা করি। মালাকুল মওত জওয়াব দেয়, তুই এতগুলো দিন অকারণে বরবাদ করেছিস, এখন একদিন কোথায় পাবে? এরপর মানুষ বলে, এক মুহূর্তেরই অবকাশ দাও। মালাকুল মওত বলে ঃ তুই অনেক মুহূর্ত বিনষ্ট করেছিস। এখন এক মুহূর্তও দেয়া হবে না। এরপর মানুষের সামনে তওবার দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং প্রাণবায়ু কণ্ঠনালীতে এসে পড়ে। বুকে গড়গড় শব্দ হয়। এসব আতঙ্কের কারণে আসল ঈমান টলমল করতে থাকে। এরপর তাকদীর ভাল হলে আত্মা তাওহীদের উপর নির্গত হয়। একেই বলে "শুভ খাতেমা"। পক্ষান্তরে তাকদীর মন্দ হলে সন্দেহ ও অস্থিরতার উপর আত্মা নির্গত হয়। এটা হচ্ছে "অশুভ খাতেমা"। এই অশুভ খাতেমা সম্পর্কেই আল্লাহ পাক এরশাদ করেন —

وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّاٰتِ حَتّٰٓى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تُبْتُ الْاٰنَ

অর্থাৎ, তাদের জন্যে তওবা নেই, যারা আমৃত্যু মন্দ কাজ করে যায়। এমনকি, যখন তাদের কারও কাছে মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়, তখন বলে, আমি এখন তওবা করছি।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْٓءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ

অর্থাৎ, আল্লাহর কাছে তাদের তওবা কবুল হবে, যারা অজ্ঞতাবশত মন্দ কাজ করে, এরপর অনতিবিলম্বে তওবা করে।

এর অর্থ এই যে, তওবার সময় ও গোনাহের সময় লাগালাগি হতে হবে। অর্থাৎ, গোনাহ হয়ে গেলে তৎক্ষণাৎ তজ্জন্যে অনুতাপ করবে এবং সাথে সাথে সৎকর্ম করবে। বেশী দিন অতিবাহিত হয়ে গেলে গোনাহের কারণে অন্তরে মরিচা ধরে যেতে পারে, যা মিটানো সম্ভব না-ও হতে পারে। এ কারণেই রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেন ঃ

اِتَّبِعِ السَّيِّئَةَ بِالْحَسَنَةِ تَمْحُهَا

অর্থাৎ, মন্দকাজের পশ্চাতেই সৎকাজ কর। সৎকাজ মন্দ কাজকে মিটিয়ে দেবে।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেন ঃ প্রিয় বৎস, তওবায় বিলম্ব করো না। কেননা, মৃত্যু হঠাৎ এসে যায়। যে ব্যক্তি অনতিবিলম্বে তওবা করে না, সে দুটি বিপদে জড়িত থাকে। এক, গোনাহের কাল দাগ যদি একের পর এক অন্তরে পড়তে থাকে, তবে মরিচা ও মোহর লেগে যাবে এবং তা মিটানোর যোগ্য থাকবে না। দুই, যদি এ সময়ের মধ্যে রোগ অথবা মৃত্যুর কবলে পড়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণের অবকাশ থাকবে না। এছাড়া অন্তর মানুষের কাছে আল্লাহ তা'আলার আমানত। এমনিভাবে জীবনও তাঁরই আমানত। অতএব, যে ব্যক্তি আমানতে খেয়ানত করবে, তার পরিণাম ভয়াবহ।

জনৈক দরবেশ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষকে দুটি রহস্যের কথা এলহামের মাধ্যমে শুনিয়ে দেন। এক, যখন মানুষ জননীর গর্ভ থেকে নির্গত হয়, তখন তাকে বলা হয় ঃ হে বান্দা! আমি তোমাকে পাকসাফ অবস্থায় দুনিয়াতে পাঠিয়েছি। তোমার আয়ুষ্কাল তোমার কাছে আমানত। এখন আমি দেখব তুমি কিভাবে এই আমানতের হেফাযত কর এবং আমার সাথে কি অবস্থায় সাক্ষাৎ কর। দুই, যখন মানুষের আত্মা নির্গত হয়, তখন বলা হয়, হে বান্দা! আমি যে আমানত তোমার কাছে

রেখেছিলাম, তুমি এ সময় পর্যন্ত তার হেফাযত করেছ কি? তুমি তোমার অঙ্গীকার পূর্ণ করে থাকলে আমিও আমার অঙ্গীকার পূর্ণ করব। আর তুমি অঙ্গীকার ভঙ্গ করে থাকলে আমি শাস্তি দেব। নিম্নোক্ত আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে— اَوْفُوْا بِعَهْدِيْ اُوْفِ بِعَهْدِكُمْ অর্থাৎ, তোমরা আমার অঙ্গীকার পূর্ণ কর, আমি তোমাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করব।

শর্তসহ তওবা কবুল হয় ঃ নিঃসন্দেহে প্রত্যেক বিশুদ্ধ তওবা কবুল হয়। যারা অন্তশ্চক্ষুর আলোকে দেখে, তারা জানে যে, সুস্থ ও নীরোগ অন্তর আল্লাহর কাছে মকবুল হয়ে থাকে এবং প্রকৃতিগতভাবে অন্তর নীরোগ সৃজিত হয়। এর সুস্থতা কেবল গোনাহের অন্ধকার ও মালিন্য আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়ার কারণে বিনষ্ট হয়। অনুশোচনার অনল এ মালিন্যকে ভস্মীভূত করে দেয় এবং সৎকর্মের নূর অন্তরের চেহারা থেকে গোনাহের তিমির দূর করে দেয়। গরম পানি ও সাবান ব্যবহার করলে যেমন কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়, তেমনি তওবা ও অনুতাপের ফলে অন্তরের নাপাকী দূর হয়ে অন্তর পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতএব মানুষের উচিত, কেবল অন্তরকে পাক ও সাফ রাখা, যাতে আল্লাহর কাছে মকবুল হয়। কোরআনের ভাষায় এই কবুল হওয়ার নাম সাফল্য। বলা হয়েছে—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا

অর্থাৎ, যে অন্তরকে পরিশুদ্ধ রেখেছে, সে সফলতা অর্জন করেছে।

কারও কারও ধারণা, তওবা বিশুদ্ধ হলেও তা কবুল হয় না। তাদের এই ধারণা এরূপ ধারণার অনুরূপ যে, সূর্য উদিত হলেও অন্ধকার দূর হয় না অথবা সাবান দিয়ে ধৌত করলেও কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার হয় না। হাঁ, যদি ময়লার স্তর কাপড়ের কলিজার মধ্যে প্রবেশ করে যায়, তবে সাবান দিয়ে তা দূর করা যাবে না। এমনিভাবে উপর্যুপরি গোনাহের কারণে যে অন্তরে মরিচা ও মোহর লেগে যায়, তার তওবা নিষ্ফল। কেউ কেউ মাঝে মাঝে কেবল "তওবা তওবা" বলে থাকে। এরূপ তওবার কোন মূল্য নেই। এটা এমন, যেমন ধোপা মুখে বলে, আমি কাপড় ধোলাই করেছি। তার এই মৌখিক কথায়ই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে কি, যে পর্যন্ত কাপড়ের ময়লা ছাড়ানোর কৌশল ব্যবহার না করবে? প্রকৃত তওবা থেকে যারা গা

বাঁচাতে চায়, এটা তাদেরই অবস্থা। দুনিয়ার প্রতি অতিমাত্রায় আসক্ত ব্যক্তিদের উপর এ অবস্থাই প্রবল।

এখন তওবা কবুল হওয়ার পক্ষে কোরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণ পেশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَهُوَ الَّذِيْ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهٖ وَيَعْفُوْ عَنِ السَّيِّاٰتِ

অর্থাৎ, তিনি আল্লাহ, যিনি আপন বান্দাদের তরফ থেকে তওবা কবুল করেন এবং গোনাহসমূহ মার্জনা করেন।

غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ

অর্থাৎ, আল্লাহ গোনাহ মার্জনাকারী এবং তওবা কবুলকারী।

তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে আরও অনেক আয়াত রয়েছে। হাদীস শরীফে আছে, আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবার কারণে অধিক সন্তুষ্ট হন। বলা বাহুল্য, সন্তুষ্ট হওয়ার মর্তবা কবুল করার উর্ধ্বে। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে— যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সকাল পর্যন্ত এবং দিনের বেলায় সন্ধ্যা পর্যন্ত গোনাহ করে, তার তওবা কবুল করার জন্যে আল্লাহ তা'আলা বাহু প্রসারিত করেন। এটা পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এখানে বাহু প্রসারিত করার অর্থ তওবা তলব বা কামনা করা বুঝা যায়। যে তলব করে, সে কবুলকারীর উর্ধ্বে। কেননা, কোন কোন কবুলকারী তলব করে না; কিন্তু তলবকারীর জন্য কবুলকারী হওয়া অপরিহার্য। অন্য এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ

لَوْ عَمِلْتُمُ الْخَطَايَا حَتّٰى تَبْلُغَ السَّمَاءَ ثُمَّ نَدِمْتُمْ لَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ

অর্থাৎ যদি তোমরা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত গোনাহ কর, এরপর অনুতপ্ত হও, তবে অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের তওবা কবুল করবেন।

হাদীসে আরও বলা হয়েছে— মানুষ কোন গোনাহ করে, এরপর এর কারণে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন— এটা কিরূপে? তিনি বললেন ঃ গোনাহ থেকে তওবা করে তাকেই দৃষ্টিতে

রাখে এবং সেই গোনাহ থেকে বিরত থাকে। অবশেষে এর দৌলতে জান্নাতে দাখিল হয়। রসূলে করীম (সাঃ) আরও বলেন ঃ

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهُ

অর্থাৎ, যে গোনাহ থেকে তওবা করে, সে সেই ব্যক্তির মত, যার কোন গোনাহ নেই।

বর্ণিত আছে, জনৈক হাবশী রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি গোনাহ করতাম। বলুন, আমার তওবা কবুল হবে কি না? তিনি বললেন ঃ অবশ্যই তওবা কবুল হবে। লোকটি চলে গেল, এরপর আবার ফিরে এসে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি যখন গোনাহ করতাম, তখন আল্লাহ আমাকে দেখতেন কি না? তিনি বললেন ঃ হাঁ, দেখতেন। একথা শুনেই হাবশী এমন সজোরে চীৎকার করে উঠল যে, সাথে সাথে তার প্রাণবায়ু বের হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে, যখন আল্লাহ তা'আলা শয়তানকে নিজের দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন, তখন শয়তান অবকাশ প্রার্থনা করল। আল্লাহ তাকে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ দিলেন। শয়তান বলল ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে পর্যন্ত মানুষের দেহে প্রাণ থাকবে, আমি তার অন্তর থেকে বের হব না। এরশাদ হল ঃ আমিও আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম খেয়ে বলছি- যে পর্যন্ত মানুষের মধ্যে প্রাণ থাকবে, সে পর্যন্ত তাদের তওবা প্রত্যাখ্যান করব না। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءُ الْوَسَخَ

অর্থাৎ, পুণ্যকাজ মন্দকাজকে বিদূরিত করে। যেমন পানি ময়লাকে বিদূরিত করে।

তওবা কবুল হওয়ার বিষয়ে এমনি ধরনের আরও অসংখ্য হাদীস বর্ণিত রয়েছে। এ সম্পর্কে মনীষীগণের উক্তিও কম নয়। হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রাঃ) বলেন ঃ

فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا

অর্থাৎ, আল্লাহ প্রত্যাবর্তনকারীদেরকে ক্ষমা করেন।

আয়াতের মর্ম এই যে, যদি কেউ গোনাহ করার পর তওবা করে এবং এরপরও গোনাহ করে এবং এরপর তওবা করে, তবে আমি তার তওবা কবুল করব। তালেক ইবনে হাবীব বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলার হক আদায় করা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু যেহেতু সে সকালে তওবা করে এবং সন্ধ্যায় তওবা করে, তাই ক্ষমার আশা করা যায়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, সে যদি সেই অপরাধ স্মরণ করে মনে মনে ভীত হয়, তবে সে অপরাধ তার আমলনামা থেকে মিটে যায়। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মানুষ মাঝে মাঝে গোনাহ করে এবং দীর্ঘকাল পর্যন্ত অনুতাপ করতে থাকে। অবশেষে সে এর দৌলতে জান্নাতে দাখিল হয়ে যায়। তখন শয়তান বলে, চমৎকার হত যদি আমি তাকে গোনাহে লিপ্ত না করতাম। এক ব্যক্তি হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে প্রশ্ন করল ঃ আমি একটি গোনাহ করেছি, আমার তওবা কবুল হবে কি না? তিনি প্রথমে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরপর তাকিয়ে লোকটিকে অশ্রুসজল দেখতে পেয়ে বললেন ঃ জান্নাতের আটটি দরজা আছে, সবগুলো খুলে এবং বন্ধ হয়; কিন্তু তওবার দরজা কখনও বন্ধ হয় না। সেখানে একজন ফেরেশতা মোতায়েন রয়েছে। তুমি নিরাশ না হয়ে আমল করে যাও।

আবদুর রহমান ইবনে আবুল কাসেমের দরবারে একবার কাফেরের তওবা এবং এই আয়াত সম্পর্কে আলোচনা শুরু হল ঃ

إِنْ يَّنْتَهُوْا يُغْفَرْ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ

অর্থাৎ, যদি তারা বিরত হয়, তবে অতীতে যা হয়েছে, ক্ষমা করা হবে।

আবদুর রহমান বললেন ঃ আমি আশা করি আল্লাহর কাছে মুসলমানের অবস্থা কাফেরের তুলনায় ভাল হবে। আমি এই রেওয়ায়েতপ্রাপ্ত হয়েছি যে, মুসলমানের তওবা করা যেন ইসলাম গ্রহণের পর আবার ইসলাম গ্রহণ করা। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেন ঃ আমি তোমাদের কাছে যে হাদীস বর্ণনা করি, তা নবী (সাঃ) থেকে শুনে অথবা ঐশীগ্রন্থ থেকে দেখে বর্ণনা করি। বান্দা গোনাহ করার পর যদি এক মুহূর্ত অনুতাপ করে, তবে পলক মারারও পূর্বে সেই গোনাহ দূর হয়ে

যায়। হযরত উমর (রাঃ) বলেন ঃ তওবাকারীদের কাছে বস। কারণ, তাদের অন্তর অধিক নম্র থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি আমি তওবা থেকে বঞ্চিত থাকি, তবে এটা আমার জন্যে মাগফেরাত থেকে বঞ্চিত থাকার তুলনায় অধিক ভয়ের কারণ। এরূপ বলার কারণ এই যে, তওবার জন্যে মাগফেরাত অপরিহার্য। তওবা কবুল হলে মাগফেরাত হয়েই যাবে।

তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে এতটুকু বর্ণনাই যথেষ্ট। এখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারে যে, এটা তো মুতাযেলা সম্প্রদায়ের কথা– যারা বলে যে, তওবা কবুল করা আল্লাহর উপর ওয়াজিব। এর জওয়াব এই যে, আমরা যে "ওয়াজিব" বলি, তার অর্থ "জরুরী"। যেমন কেউ বলে—সাবান দিয়ে কাপড় ধৌত করলে ময়লা দূর হওয়া ওয়াজিব অথবা পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি পান করলে পিপাসা দূর হওয়া ওয়াজিব অথবা কাউকে দীর্ঘ সময় পানি পান করতে না দিলে পিপাসা লাগা ওয়াজিব অথবা কেউ সদাসর্বদা পিপাসার্ত থাকলে তার মরে যাওয়া ওয়াজিব। মুতাযেলা সম্প্রদায় যে অর্থে ওয়াজিব বলে, সে অর্থে এসব বিষয়ের মধ্যে কোনটিই ওয়াজিব নয়। আমাদের উদ্দেশ্য এতটুকু যে, আল্লাহ্ তা'আলা এবাদতকে গোনাহের কাফফারা করেছেন এবং পাপকে মিটানোর জন্যে পুণ্য সৃষ্টি করেছেন, যেমন পানিকে পিপাসা নিবৃত্ত করার জন্যে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর কুদরতে এর বিপরীত হওয়ারও অবকাশ রয়েছে। সারকথা, আল্লাহর উপর কোনকিছুই ওয়াজিব নয়। কিন্তু তিনি যে বিষয়ের ইচ্ছা করেছেন, তা হওয়া অবশ্যই ওয়াজিব।

এখানে আরও একটি প্রশ্ন হতে পারে যে, তওবাকারীদের প্রত্যেকেই তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ করতে থাকে; অথচ যে পানি পান করে, সে পিপাসা নিবৃত্তির ব্যাপারে সন্দেহ করে না। অতএব, তওবাকারী সন্দেহ করবে কেন? জওয়াব এই যে, তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার ব্যাপারে যে সকল জরুরী শর্ত রয়েছে, সেগুলো পাওয়া গেল কি না, সন্দেহ সে বিষয়েই হয়ে থাকে। পানি পান করার ক্ষেত্রে এরূপ কোন শর্ত নেই। তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ইনশাআল্লাহ্ পরে বর্ণনা করা হবে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যে সকল গোনাহ্ থেকে তওবা করা হয়

উল্লেখ্য, তওবার অর্থ হল গোনাহ্ পরিত্যাগ করা। কোন কিছু পরিত্যাগ করা তখনই সম্ভব, যখন তাকে জেনে নেয়া যায়। তওবা ওয়াজিব বিধায় গোনাহসমূহ চেনাও ওয়াজিব। যে কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হয়, তাই গোনাহ্। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে গেলে খোদায়ী বিধি-বিধানাবলী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করতে হবে। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য তা নয়। তাই নিম্নে সংক্ষেপে গোনাহসমূহের প্রকারভেদ তিনটি শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হচ্ছে।

বান্দার দোষ ও গুণের দিক দিয়ে গোনাহের প্রকারভেদ ঃ মানুষের স্বভাব ও চরিত্র অনেক। কিন্তু যেগুলো দ্বারা গোনাহ্ অস্তিত্ব লাভ করে, সেগুলো চার প্রকারে সীমিত— প্রতিপালকসুলভ স্বভাব, শয়তানসুলভ স্বভাব, পশুসুলভ স্বভাব এবং হিংস্র স্বভাব। প্রতিপালকসুলভ স্বভাব অহংকার, গর্ব, স্বৈরাচার, প্রশংসাপ্রীতি, সম্মান ও বিত্তপ্রীতি ইত্যাদি জন্ম দেয়। এ স্বভাব থেকে এমন সব কবীরা গোনাহ্ উৎপন্ন হয়, যেগুলোকে মানুষ গোনাহ্ গণ্য করে না। অথচ সেগুলো অত্যন্ত মারাত্মক ও অধিকাংশ গোনাহের মূল হয়ে থাকে। শয়তানসুলভ স্বভাব থেকে হিংসা, অবাধ্যতা, কূটকৌশল, ষড়যন্ত্র, ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি বিষয় গজিয়ে উঠে। নিফাক, বেদআত ও পথভ্রষ্টতাও এর অন্তর্ভুক্ত। পশুসুলভ স্বভাব থেকে যেসব বিষয় অংকুরিত হয়, সেগুলো হচ্ছে তীব্র লোভ ও লালসা, উদর ও যৌনাঙ্গের স্পৃহা, ব্যভিচার ও সমকামিতা, চুরি, এতীমের মাল আত্মসাৎ করা, হারাম অর্থ সঞ্চয় ইত্যাদি। হিংস্র স্বভাবের ভেতর থেকে বের হয়ে আসে ক্রোধ, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা, মারপিট, গালিগালাজ, হত্যা ইত্যাদি।

মানুষের মধ্যে এ চারটি স্বভাব জন্মগতভাবে একের পর এক আগমন করে। সর্বপ্রথম পশুসুলভ স্বভাব প্রবল হয়। এরপর হিংস্রস্বভাব প্রকাশ পায়। এ স্বভাবদ্বয় একত্রিত হয়ে বুদ্ধি-বিবেককে প্রতারিত করে এবং এ

থেকেই শয়তানী স্বভাব জোরদার হয়। সবশেষে প্রতিপালকসুলভ স্বভাব অর্থাৎ, গর্ব, অহংকার, ইযযত ও বড়ত্বের স্পৃহা এবং সকলের উপর সরদারী করার ইচ্ছা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মোটকথা, এই স্বভাব চতুষ্টয়ই হচ্ছে গোনাহ ও নাফরমানীর উৎস। এরপর এগুলো থেকে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে গোনাহ ছড়িয়ে পড়ে। তন্মধ্যে কিছু গোনাহ বিশেষভাবে অন্তরের সাথে সম্পর্কযুক্ত; যেমন কুফর, নিফাক, বেদআত ইত্যাদি। কিছু গোনাহ চক্ষু ও কর্ণের সাথে, কিছু উদর ও যৌনাঙ্গের সাথে এবং কিছু হাত ও পায়ের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলো সব সুস্পষ্ট বিধায় বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন নেই।

দ্বিতীয়ত গোনাহ্ দু'প্রকার। এক, যা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের মধ্যে হয়ে থাকে; যেমন নামায, রোযা ও অন্যান্য বিশেষ ফরযসমূহ পালন না করা। দুই, যা মানুষের পারস্পরিক হকের সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে থাকে। যেমন যাকাত না দেয়া, কাউকে হত্যা করা, কারও ধন-সম্পদ ছিনতাই করা, গালি দেয়া ইত্যাদি। যে সকল গোনাহ মানুষের পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলো থেকে অব্যাহতি পাওয়া খুবই কঠিন। পক্ষান্তরে যে সকল গোনাহ আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের সাথে সম্পৃক্ত, সেগুলোর মধ্যে ক্ষমা পাওয়ার আশা প্রবল— যদি তা শিরক না হয়। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে—

الدواوين ثلثة ديوان يغفر وديوان لا يغفر وديوان لا يترك

অর্থাৎ, আমলনামা তিন প্রকার। এক প্রকার ক্ষমা করা হবে, এক প্রকার ক্ষমা করা হবে না এবং এক প্রকার ছেড়ে দেয়া হবে না।

প্রথম প্রকার আমলনামা যা ক্ষমা করা হবে, সেসব গোনাহ, যা আল্লাহ তা'আলা ও মানুষের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দ্বিতীয় প্রকার আমলনামার অর্থ শিরক। এটা ক্ষমা করা হবে না। তৃতীয় প্রকার আমলনামার মানে মানুষের পারস্পরিক গোনাহ। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষমা না করা পর্যন্ত এসব গোনাহের চুলচেরা হিসাব হবে।

গোনাহের তৃতীয় বিভাজন এই যে, গোনাহ হয় সগীরা হবে, না হয় কবীরা। এগুলোর সংজ্ঞা সম্পর্কে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে।

কেউ কেউ বলেন ঃ সগীরা বলতে কোন গোনাহ নেই; বরং যে বিষয়ে খোদায়ী আদেশের বিরুদ্ধাচরণ হবে, তা কবীরাই হবে। এই উক্তি অগ্রাহ্য। কেননা, সগীরা গোনাহের অস্তিত্ব কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا

অর্থাৎ যে বিষয়ে তোমাদেরকে নিষেধ করা হয়, তার মধ্য থেকে যদি কবীরাগুলো থেকে বেঁচে থাক, তবে আমি তোমাদের মন্দ কাজসমূহকে সরিয়ে দেব এবং তোমাদের সম্মানের স্থানে দাখিল করব।

অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে—

تَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

অর্থাৎ, তোমরা বেঁচে থাক কবীরা তথা বড় গোনাহ থেকে এবং নির্লজ্জতা থেকে– ছোট ছোট মলিনতা বাদে।

হাদীস শরীফে আছে—

الصَّلَوٰتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ يُكَفِّرْنَ مَا بَيْنَهُنَّ إِنِ اجْتُنِبَ الْكَبَائِرُ۔

অর্থাৎ, পাঞ্জেগানা নামায এবং এক জুমআ অন্য জুমআ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সকল গোনাহ দূর করে দেয়— যদি বড় গোনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়।

আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আসের রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَيَمِيْنُ الْغَمُوْسِ -

অর্থাৎ, কবীরা গোনাহ হচ্ছে আল্লাহর সাথে শরীক করা, পিতামাতার নাফরমানী করা, কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া।

কবীরা গোনাহের সংখ্যা সম্পর্কে সাহাবী ও তাবেঈগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) এর সংখ্যা চার এবং হযরত উমর (রাঃ) সাত বর্ণনা করেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমরের মতে নয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) যখন জানতে পারলেন যে, ইবনে উমর (রাঃ) কবীরা গোনাহের সংখ্যা সাত বলেন, তখন তিনি বললেন ঃ সাত বলার চেয়ে সত্তর বলাই অধিক সঙ্গত। হযরত ইবনে আব্বাস একথাও বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা যা নিযিদ্ধ করেছেন তাই কবীরা। কেউ কেউ বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যে গোনাহের কারণে দোযখের ওয়াদা করেছেন, তা কবীরা। কারও মতে যে গোনাহের কারণে দুনিয়াতে "হদ" অর্থাৎ, শাস্তি ওয়াজিব হয়, তা কবীরা। কেউ কেউ বলেন ঃ কবীরা গোনাহের সংখ্যা অজানা, যেমন শবে কদরের বিশেষ মুহূর্ত অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট। হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ)-কে এর সংখ্যা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ সূরা নেসার শুরু থেকে إِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ পর্যন্ত যতগুলো গোনাহ আল্লাহ তা'আলা নিষিদ্ধ করেছেন, সে সবগুলোই কবীরা। আবূ তালেব মক্কী বলেন ঃ কবীরা গোনাহ সত্তরটি। হাদীস থেকে এবং হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে মসউদ ও ইবনে উমর প্রমুখের উক্তি থেকে এগুলো আমি সংগ্রহ করেছি। তন্মধ্যে চারটি অন্তরে অর্থাৎ শিরক, গোনাহ উপর্যুপরি করে যাওয়া, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় না করা। আর চারটি জিহ্বার সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সৎপুরুষকে ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া, অসত্যকে সত্য প্রতিপন্ন করার জন্যে মিথ্যা কসম খাওয়া এবং জাদু করা। তিনটি উদর সম্পর্কিত— মদ্য পান করা, এতীমের অর্থ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করা এবং জেনেশুনে সুদ খাওয়া। দুটি যৌনাঙ্গের সাথে সম্পর্কিত। অর্থাৎ ব্যভিচার ও সমকামিতা। দু'টি হাতের সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ হত্যা ও চুরি। একটি পায়ের সাথে সম্পর্কিত; অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা। একটি সমস্ত দেহের সাথে সম্পর্কযুক্ত। অর্থাৎ, পিতামাতার

নাফরমানী করা। এই উক্তি যদিও কাছাকাছি; কিন্তু এতেও পূর্ণতা হয় না। কেননা, বাস্তবে কমবেশী হতে পারে। উদাহরণতঃ এ উক্তি অনুযায়ী সুদ খাওয়া ও এতীমের অর্থ আত্মসাৎ করা কবীরা গোনাহ। এটা ধন সম্পর্কিত গোনাহ। প্রাণ সম্পর্কিত গোনাহ হত্যা লেখা হয়েছে। চক্ষু উৎপাটিত করা, হাত কাটা ইত্যাদি লেখা হয়নি। এমনিভাবে এতীমকে মারা ও তার অঙ্গ কর্তন করা নিঃসন্দেহে কবীরা গোনাহ। এ ছাড়া হাদীসে একটি গালির পরিবর্তে দু'গালি দেয়া এবং মুসলমানের মানহানি করাকেও কবীরা গোনাহ বলা হয়েছে।

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী প্রমুখ সাহাবী বলেন ঃ তোমরা এমন আমল কর, যা তোমাদের মতে চুলের চেয়েও অধিক সূক্ষ্ম; কিন্তু আমরা রসূলে করীম (সাঃ)-এর আমলে এসব আমলকে কবীরা গোনাহ মনে করতাম।

কিন্তু এতগুলো উক্তি সত্ত্বেও কেউ যদি চুরি সম্পর্কে জানতে চায় যে, এটা কবীরা কি না, তবে কবীরার অর্থ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত না হওয়া পর্যন্ত এটা যথাযথরূপে জানা সম্ভবপর নয়। কেননা, কবীরা শব্দটি শাব্দিক দিক দিয়ে অস্পষ্ট। অভিধানে অথবা শরীয়তে এর কোন বিশেষ অর্থ নেই। কবীরা ও সগীরা আপেক্ষিক বিষয়াদির অন্যতম। যা গোনাহ তা কতক গোনাহের তুলনায় বড় এবং কতক গোনাহের তুলনায় ছোট হতে পারে। অর্থাৎ, উপরের দিকে দেখলে ছোট এবং নিচের দিকে দেখলে বড় মনে হবে। উদাহরণতঃ পর-নারীর সাথে শয়ন করা যিনার তুলনায় কম এবং কেবল চোখে দেখার তুলনায় বেশী গোনাহ।

কিন্তু যেহেতু কোরআন মজীদে এবং হাদীস শরীফে কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকার আদেশ রয়েছে, তাই কবীরা অর্থ জানা একান্ত জরুরী। নতুবা আদেশ পালিত হবে কিরূপে ?

অতএব, এ সম্পর্কে সুচিন্তিত বিষয় এই যে, শরীয়তে গোনাহ তিন প্রকার। এক, যার বড় হওয়া সকলেরই জানা। দুই, যা ছোট গোনাহ বলে গণ্য। তিন, যার সম্পর্কে শরীয়তের বিধান কিছুই জানা নেই। এরূপ সন্দিগ্ধ ও অস্পষ্ট গোনাহ জানার জন্যে কোন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা পাওয়ার আশা করা বৃথা। কেননা, এটা তখনই সম্ভব হত, যখন রসূলে করীম (সাঃ) এ সম্পর্কে

বলে দিতেন যে, দশটি অথবা পাঁচটি গোনাহ কবীরা। এরপর স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিতেন যে, এই এই দশটি অথবা এই এই পাঁচটি। কিন্তু বাস্তবে এরূপ হয়নি; বরং কতক রেওয়ায়েতে কবীরার সংখ্যা তিন এবং কতক রেওয়ায়েতে উল্লেখ করা হয়েছে সাত। এরপর আরও বর্ণিত আছে যে, এক গালির বিনিময়ে দু'গালি দেয়া অন্যতম কবীরা। অথচ এটা পূর্বোক্ত তিনের মধ্যেও অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সাতের মধ্যেও নয়। এ থেকে জানা গেল যে, কবীরাকে কোন বিশেষ সংখ্যায় সীমিত করা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উদ্দেশ্য ছিল না। অতএব, শরীয়ত প্রবর্তক নিজেই যখন কোন সংখ্যা নির্দিষ্ট করেননি, তখন অন্যারা তা গণনা করার আশা কিরূপে করতে পারে? সংখ্যা নির্দিষ্ট না করার কারণ সম্ভবত এই ছিল, যাতে মানুষ কবীরা গোনাহকে ভয় করতে থাকে এবং এই ভয়ের কারণে সগীরা গোনাহ থেকেও বেঁচে থাকে; যেমন শবে বরাতকে এ জন্যে অস্পষ্ট রাখা হয়েছে, যাতে মানুষ এর জন্যে মেহনত অব্যাহত রাখে।

অবশ্য আমাদের দ্বারা কবীরার প্রকারভেদ সঠিকভাবে বলে দেয়া এবং এর খুঁটিনাটি বিষয়াদি প্রবল ধারণা ও অনুমানের উপর ছেড়ে দেয়া সম্ভব। এছাড়া, যে গোনাহটি সর্ববৃহৎ কবীরা, তারও সংজ্ঞা বলে দিতে পারি; কিন্তু যেটি সর্বকনিষ্ঠ সগীরা গোনাহ, তার সংজ্ঞা দেয়া সম্ভব নয়।

শরীয়তের প্রমাণাদি ও অন্তর্দৃষ্টির আলোকে আমরা জানি সকল শরীয়তের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মানুষ আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ করুক এবং দীদারে ইলাহীর সৌভাগ্য অর্জন করুক। কিন্তু যে পর্যন্ত মানুষ আল্লাহর সত্তা, তাঁর গুণাবলী, ঐশীগ্রন্থ ও রসূলগণকে না চিনবে এ সৌভাগ্য অর্জিত হতে পারে না। এ আয়াতে এদিকেই ইশারা করা হয়েছে—

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ

অর্থাৎ, মানুষ ও জিনকে সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যাতে তারা আমার বান্দা হয়ে যায়।

বান্দা তখন বান্দা হয়, যখন নিজের মালিকের প্রতিপালকত্ব ও নিজের দাসত্বকে চিনে। এটাই রসূল প্রেরণের আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু পার্থিব জীবন ছাড়া এই উদ্দেশ্য পূর্ণ হয় না। তাই দুনিয়াকে আখেরাতের কৃষিক্ষেত্র বলা

হয়েছে। এ থেকে জানা গেল যে, আখেরাতের খাতিরে দুনিয়ার হেফাযতও জরুরী। আখেরাতের খাতিরে দুনিয়া সম্পর্কিত বিষয় দুটি। একটি প্রাণ, অপরটি ধন-সম্পদ। অতএব, যে গোনাহ দ্বারা খোদায়ী মারেফতের দরজা বন্ধ হয়ে যায়, তা সর্ববৃহৎ কবীরা। এরপর সেই কবীরার পালা আসে, যা দ্বারা জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়। কেননা, জীবিকা দ্বারাই প্রাণীর জীবন।

সুতরাং আসল উদ্দেশ্যে পৌঁছার জন্যে যথাক্রমে তিনটি বিষয়ের হেফাযত জরুরী হল। প্রথম, অন্তরে খোদায়ী মারেফতের হেফাযত। দ্বিতীয়, দেহে প্রাণের হেফাযত। তৃতীয়, ধন-সম্পদের হেফাযত। এ বিষয়ত্রয়ের উপর ভিত্তি করেই গোনাহের বিভক্তি হয়ে থাকে। অর্থাৎ সর্ববৃহৎ গোনাহ সেটি, যা খোদায়ী মারেফতের অন্তরায় হয়। এর নিচে সে গোনাহ, যা মানুষের প্রাণরক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এরপর সেই গোনাহ— যা দ্বারা জীবিকার দ্বার রুদ্ধ হয়। এই তিনটি বিষয় সম্পর্কে কোন ধর্মেই মতভেদ হতে পারে না।

অতএব, কবীরা গোনাহের তিনটি স্তর রয়েছে। এক, যা আল্লাহ ও রসূলের মারেফতের পরিপন্থী। একে বলা হয় কুফর। এর উর্ধ্বে কোন কবীরা নেই। এর মধ্যে রয়েছে আল্লাহর আযাবকে ভয় না করা এবং তাঁর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। আল্লাহর সত্তা, গুণাবলী ও ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত সকল প্রকার বেদআতও এর কাছাকাছি। দুই, প্রাণ সম্পর্কিত কবীরা। সুতরাং কাউকে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। তবে কুফরের তুলনায় কম। কেননা, কুফরের কারণে মূল উদ্দেশ্য ফওত হয়ে যায়। আর হত্যার কারণে উদ্দেশ্যের উপায় বিনষ্ট হয়ে যায়। কেননা, পার্থিব জীবন খোদায়ী মারেফতের ওসীলা। হত্যা করলে এই ওসীলা লোপ পায়। হাত-পা কর্তন করা এবং মারপিট করা, যা মৃত্যুর কারণ হয়, তাও কবীরা গোনাহের মধ্যে গণ্য। তবে ইচ্ছাকৃত হত্যা অধিক কঠোর কবীরা। যিনা ও সমকামিতাও এই স্তরের মধ্যে দাখিল। সমকামিতা এ জন্যে দাখিল যে, যখন ধরে নেয়ার পর্যায়ে সকলেই পুরুষদের সাথে যৌনকর্ম সম্পাদন করতে শুরু করবে, তখন মানুষের বংশ বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং হত্যার মাধ্যমে মানুষের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করা যেমন কবীরা গুনাই, তেমনি যিনা ও ব্যভিচারও কবীরা গুনাহ। কেননা, তার দ্বারা যদিও বংশ বিস্তার বন্ধ হয় না;

কিন্তু বংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে এবং পারস্পরিক উত্তরাধিকার খতম হয়ে যায়। ফলে, জীবনের শৃঙ্খলাই বিনষ্ট হয়ে যায়। তবে যিনা হত্যার তুলনায় কম কবীরা।

তিন, ধন-সম্পদ সম্পর্কিত কবীরা। সুতরাং একে অন্যের ধন-সম্পদ চুরি করে, ছিনতাই করে অথবা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে হস্তগত করা জায়েয নয়। তবে একের ধন-সম্পদ অন্যে নিয়ে নিলে তা ফেরত দেয়া সম্ভব। খেয়ে ফেললে বা ব্যয় করে ফেললে মূল্য অথবা বিনিময় দিতে পারে। এ দিক দিয়ে ধন-সম্পদ নেয়া তেমন গুরুতর নয়। হাঁ, যদি এভাবে নেয় যে, ক্ষতিপূরণ অসম্ভব হয়ে যায়, তখন এটা কবীরা গোনাহ হওয়া উচিত। এভাবে নেয়ার সম্ভাব্য পন্থা চারটি। এক, গোপনে নেয়া, যাকে চুরি বলা হয়। এতে কেন নিল, তা অজানা থাকার কারণে ক্ষতিপূরণ সম্ভব নয়। দুই, এতীমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। বয়সের স্বল্পতা হেতু এতীম নালিশ করতে অক্ষম বিধায় এটাও গোপন পন্থার অন্তর্ভুক্ত। তিন, মিথ্যা সাক্ষ্যদানের মাধ্যমে কারও আর্থিক ক্ষতি করা। চার, মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়ে গচ্ছিত সামগ্রীর মালিক হয়ে যাওয়া।

এ চারটি পন্থা হারাম হওয়ার ব্যাপারে শরীয়তসমূহের মধ্যে মতভেদ থাকতে পারে। যদিও এগুলোর কোন কোনটিতে শরীয়ত কোন শাস্তি নির্ধারণ করেনি। কিন্তু পর্যাপ্ত নিন্দাবাণী উচ্চারণ করেছে এবং পার্থিব শৃঙ্খলা বিধানে এগুলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। তাই এগুলো কবীরা হওয়াই সঙ্গত। সূদ খাওয়ার মধ্যে কেবল এতটুকুই রয়েছে যে, অপরের ধন-সম্পদ তার সন্তুষ্টিক্রমে খাওয়া হয়। কিন্তু এতে শরীয়তের সন্তুষ্টি নেই। আর ধন ছিনতাইয়ের মধ্যে কারও সন্তুষ্টি থাকে না। এতদসত্ত্বেও ছিনতাই কবীরা গোনাহ নয়। কাজেই সূদ খাওয়া কবীরা না হওয়া দরকার। কারণ, এতে ধনের মালিকের সম্মতি থাকে এবং কেবল শরীয়তের সম্মতি অনুপস্থিত থাকে। যদি বলা হয় যে, শরীয়তে সূদ সম্পর্কে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এবং পারলৌকিক শাস্তির কথা বলা হয়েছে, এতে কবীরা হওয়াই বুঝা যায়, তবে ছিনতাই ইত্যাদি যুলুমের ব্যাপারেও তো এরূপই বলা হয়েছে। এগুলোরও কবীরা হওয়া উচিত। অথচ এগুলো কবীরার তালিকায় দাখিল না হওয়াই প্রবল ধারণা।

এখন আবু তালেব মক্কী বর্ণিত কবীরাসমূহের মধ্যে গালি দেয়া, মদ্যপান করা, জাদু করা, জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানী করা সম্পর্কে আলোচনা করা দরকার। এগুলোর মধ্যে মদ্যপান কবীরা গোনাহ হওয়া উপযুক্ত। প্রথমত, এ কারণে যে, শরীয়ত এ সম্পর্কে কঠোর শাস্তিবাণী উচ্চারণ করেছে। দ্বিতীয়ত, যুক্তির নিরিখেও এরূপ হওয়া উচিত। যুক্তি এই যে, প্রাণের হেফাযত করা যেমন জরুরী, বুদ্ধির হেফাযত করাও তেমনি জরুরী। কারণ, বুদ্ধি ছাড়া প্রাণ বেকার। এতে বুঝা গেল যে, মদ্যপান করে বুদ্ধি লুপ্ত করাও কবীরা গোনাহ। কিন্তু এই যুক্তি এক ফোঁটা মদের বেলায় প্রযোজ্য নয়। কেননা, এতে বুদ্ধি লোপ পায় না। সুতরাং এক ফোঁটা মদমিশ্রিত পানি পান করলে তা কবীরা না হওয়া উচিত; বরং একে নাপাক পানি বলা উচিত। কিন্তু শরীয়ত মদের জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করেছে বিধায় একে কবীরা গণ্য করা হয়। শরীয়তের সকল রহস্য সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়া মানুষের সাধ্যে নেই। সুতরাং এর কবীরা হওয়ার ব্যাপারে ইজমা প্রমাণিত হলে তা মেনে নেয়া ওয়াজিব।

অপবাদ আরোপের অবস্থা এই যে, এতে কেবল মানহানি হয়। মানের মর্যাদা ধন-সম্পদের তুলনায় কম। অপবাদের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। সর্ববৃহৎ স্তর হচ্ছে যিনার অপবাদ আরোপ করা। শরীয়তে এটা খুব গুরুতর ব্যাপার। তাই এর জন্যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে। আমার প্রবল ধারণা, শরীয়তে যেসব গোনাহের কারণে "হদ" তথা শাস্তি ওয়াজিব হয়, সাহাবায়ে কেরাম সেগুলোকে কবীরা গণ্য করতেন। এদিক দিয়ে অপবাদ আরোপও কবীরা।

জাদুর অবস্থা এই যে, যদি তাতে কুফরী কথাবার্তা না থাকে, তবে কবীরা গোনাহ। নতুবা এর গুরুত্ব ততটুকুই হবে, যতটুকু ক্ষতি এর দ্বারা হবে; যেমন জীবন নাশ করা, রুগ্ন হওয়া ইত্যাদি। যুদ্ধের সারি থেকে পলায়ন করা এবং পিতা-মাতার নাফরমানীও কিয়াস অনুযায়ী এমন যে, এ সম্পর্কে মত প্রকাশে বিরত থাকাই উপযুক্ত। এ ছাড়া এটা অকাট্যরূপে জানা আছে যে, যিনা ছাড়া মানুষকে অন্য কোন গালি দেয়া, মারা, যুলুম করা অর্থাৎ ধন ছিনিয়ে নেয়া, গৃহ থেকে উৎখাত করে দেয়া কবীরার

অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, কবীরা গোনাহের সর্বোচ্চ সংখ্যা সতের বর্ণিত আছে। এগুলো সেই সতেরোর মধ্যে উল্লিখিত নেই। এমতাবস্থায় যদি পলায়ন করা এবং পিতামাতার নাফরমানী করাকেও কবীরা বলা থেকে বিরত থাকা যায়, তবে তা অবান্তর হবে না। কিন্তু হাদীসে পলায়ন ও পিতামাতার নাফরমানীকে কবীরা নামে অভিহিত করা হয়েছে। এদিক দিয়ে এগুলোকে কবীরার তালিকায় দাখিল করা উচিত।

পূর্বোল্লিখিত এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে আমি তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি মাফ করে দেব। এ থেকে জানা যায়, কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকলে তা সগীরা গোনাহের জন্যে কাফ্‌ফারা হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এটা সর্বাবস্থায় নয়; বরং তখন কাফ্‌ফারা হবে, যখন সামর্থ ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও বেঁচে থাকে। উদাহরণতঃ যদি কোন ব্যক্তি কোন নারীর সাথে যিনা করতে সক্ষম হয় এবং মনে আগ্রহও থাকে, এরপর সে নিজেকে বিরত রাখে এবং শুধু দেখে ও স্পর্শ করেই ক্ষান্ত থাকে, তবে যে অন্ধকার দেখা অথবা স্পর্শ করার কারণে তার অন্তরে সৃষ্টি হবে, তার তুলনায় নিজেকে যিনা থেকে বাঁচিয়ে রাখার কারণে নূর বেশী হবে। কাফ্‌ফারা হওয়ার অর্থ এটাই। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি পুরুষত্বহীন হয়, অথবা কোন কারণে সহবাসে অক্ষম হয়, তবে তার বিরত থাকা কাফ্‌ফারা হবে না। এমনিভাবে যে ব্যক্তি মদ্যপানে মোটেই আগ্রহী নয়, এমনকি তা হালাল হলেও পান করত না, তার মদ্যপান থেকে বিরত থাকা সেসব ছোট গোনাহের জন্যে কাফফারা হবে, যা মদ্যপানের সূচনাতে হয়ে থাকে।

কবীরা যেহেতু আখেরাত সম্পর্কিত বিধানাবলীর অন্যতম, তাই শরীয়তে এর সঠিক সংখ্যা ও পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বর্ণিত হয়নি। উদ্দেশ্য, মানুষ যাতে নির্ভীক ও শংকামুক্ত হয়ে সগীরা গোনাহসমূহে লিপ্ত হয়ে না পড়ে। হযরত আবু হুরায়রার রেওয়ায়েতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ এক নামায অন্য নামাযের সময় পর্যন্ত কাফফারা হয় এবং এক রমযান অন্য রমযান পর্যন্ত কাফফারা হয় তিনটি গোনাহ ছাড়া— শিরক, সুন্নত বর্জন ও চুক্তি ভঙ্গকরণ। সাহাবায়ে কেরাম প্রশ্ন করলেন ঃ সুন্নত বর্জন ও চুক্তি ভঙ্গ

বলতে উদ্দেশ্য কি? তিনি বললেন ঃ দল থেকে বের হয়ে যাওয়া সুন্নত বর্জন এবং কারও সাথে চুক্তি করার পর তলোয়ার নিয়ে তার সাথে যুদ্ধ করার জন্যে বের হয়ে পড়া চুক্তি ভঙ্গকরণ।

জান্নাত ও দোযখের স্তর পাপ ও পুণ্যের স্তরের উপর নির্ভরশীল ঃ

প্রকাশ থাকে যে, দুনিয়ার জীবন আখেরাতের মোকাবিলায় জাগরণের মোকাবিলায় স্বপ্নের মত। হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত । বলা হয়েছে—

اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا اِنْتَهَوْا

অর্থাৎ, মানুষ নিদ্রিত। যখন তারা মরে যাবে, জাগ্রত হবে।

জাগরণের বিষয় যখন স্বপ্নে আসে, তখন তা দৃষ্টান্তের মত মনে হয়। ফলে, তা'বীর তথা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়। এমনিভাবে আখেরাতের জাগরণে যে অবস্থা হবে, তা দুনিয়ার স্বপ্নে দৃষ্টান্তস্বরূপই প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ, স্বপ্নের মত এ অবস্থাও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ হবে। এখানে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত তিনটি কাহিনী নমুনাস্বরূপ উল্লেখ করছি।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে সীরীনের খেদমতে এসে আরয করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি, আমার হাতে একটি নামাঙ্কিত মোহর রয়েছে। তা দ্বারা আমি মানুষের মুখে এবং যৌনাঙ্গে মোহর করছি। তিনি বললেন ঃ মনে হয় তুমি মুয়াযযিন, রমযানে সোবহে সাদেক হওয়ার পূর্বে আযান দাও। লোকটি বলল ঃ আপনি ঠিকই বলেছেন। অন্য এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি তৈলকে তৈলবীজের মধ্যে ঢালছি। তিনি বললেন ঃ তুমি কোন বাঁদী ক্রয় করে থাকলে তার অবস্থা তদন্ত করে দেখ। মনে হয় সে তোমার জননী। কেননা, তৈলের মূল হচ্ছে তৈলবীজ। এ থেকে বুঝা যায় যে, লোকটি তার মূল অর্থাৎ জননীর কাছে যায়। এরপর লোকটি তদন্ত করে জানতে পারল যে, তার বাঁদী বাস্তবিকই তার জননী ছিল। অন্য এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল ঃ আমি স্বপ্নে দেখেছি যে, মোতির হার শূকরের গলায় পরিধান করাচ্ছি। হযরত ইবনে সীরীন বললেন ঃ মনে হয় তুমি জ্ঞানের বিষয়াদি অযোগ্য লোকদেরকে শিখিয়ে যাচ্ছ। বাস্তবে তাই ছিল। এসব ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল রূপক বিষয়বস্তুকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়। রূপক বিষয় বলে আমাদের উদ্দেশ্য এমন বিষয়, যাকে

প্রতীক হিসেবে দেখলে শুদ্ধ ও সঠিক মনে হয়, আর বাহ্যিক আকৃতির প্রতি লক্ষ্য করলে মিথ্যা মনে হয়।

উদাহরণতঃ প্রথম স্বপ্নের ব্যাখ্যায় যদি মুয়াযযিন কেবল বাহ্যিক আংটির প্রতি দেখত এবং তা দ্বারা মোহর করা বুঝত, তবে এ স্বপ্নকে মিথ্যা মনে করতে বাধ্য হত। কেননা, এ কাজ সে কখনও করেনি। কিন্তু মর্ম ও প্রতীকের প্রতি লক্ষ্য করার ফলে স্বপ্নটি সত্য হয়ে গেল। কারণ, মোহর করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে বাধা দেয়া। মুয়াযযিন রমযান মাসে সোবহে সাদেকের পূর্বে আযান দিয়ে মানুষকে পানাহারে বাধা দিত। পয়গম্বরগণকে আদেশ করা হয়েছে তারা যেন মানুষের সাথে তাদের বুদ্ধির পরিমাপ অনুযায়ী কথাবার্তা বলেন। মানুষের বুদ্ধির পরিমাপ এই যে, তারা নিদ্রিত। নিদ্রিত ব্যক্তির কাছে বস্তুর স্বরূপ রূপক আকারেই উদঘাটিত হয়। তাই পয়গম্বরগণও মানুষের সাথে রূপক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বলেন, যাতে তারা মূল উদ্দেশ্য বুঝে নেয়, যদিও বাহ্যিক শব্দ দ্বারা অন্য কিছু অর্থ হয়। মৃত্যুর পর মানুষ যখন জাগ্রত হবে, তখন বুঝবে, পয়গম্বরগণের কথা ঠিকই ছিল। উদাহরণতঃ হাদীসে বলা হয়েছে—

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ اِصْبَعَيْنِ مِنْ اَصَابِعِ الرَّحْمٰنِ

অর্থাৎ, মুমিনের অন্তর আল্লাহর দু'অঙ্গুলির মধ্যস্থলে অবস্থিত

আলেমগণ ব্যতীত কেউ এ হাদীসের মর্ম বুঝে না। মূর্খদের দৃষ্টি কেবল এর শাব্দিক অর্থের উপর থাকে। কেননা, তারা "তাভীল" নামক তাফসীর সম্পর্কে অজ্ঞ। ফলে, তারা শাব্দিক অর্থ অনুযায়ী আল্লাহ তা'আলার হাত ও অঙ্গুলি সপ্রমাণ করে। (নাউযুবিল্লাহ)

এমনিভাবে অপর এক হাদীসে আছে اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰى صُوْرَتِهٖ (আল্লাহ আদমকে নিজের আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন।)

এতে মূর্খরা কেবল বাহ্যিক আকৃতি ও রং বুঝে নিয়ে আল্লাহ তা'আলাকেও এমনি মনে করে। অথচ তিনি এ সকল বিষয় থেকে পবিত্র। এসব কারণেই কতক লোক আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর ব্যাপারে দারুণ

হোঁচট খেয়েছে। এমনকি, তারা আল্লাহর কালামকে অক্ষর ও শব্দভুক্ত মনে করে নিয়েছে। আখেরাতের বিষয় সম্পর্কে যে সকল দৃষ্টান্ত হাদীসে বর্ণিত রয়েছে কেউ কেউ সেগুলোকে অস্বীকার করে একারণে যে, তাদের কাছে বাহ্যিক শব্দই উদ্দেশ্য। আর বাহ্যিক শব্দের মাঝে বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণতঃ হাদীসে আছে—

يُؤْتٰى بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِىْ صُوْرَةِ كَبْشٍ اَمْلَحَ فَيُذْبَحُ

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মৃত্যুকে সাদা ভেড়ার আকারে উপস্থিত করে যবাহ করা হবে।

ধর্মদ্রোহী বোকারা এটা মানে না এবং পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করে। প্রমাণ এই যে, মৃত্যু একটি অশরীরী বস্তু, আর ভেড়া শরীরী। অতএব, অশরীরী বস্তুর শরীরী হয়ে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা এসব নির্বোধকে আপন রহস্যাবলীর মারেফত থেকে অনেক ক্রোশ দূরে রেখেছেন। তিনি বলেন ঃ

وَمَا يَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُوْنَ

অর্থাৎ, কেবল বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এসব রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

মূর্খরা একথাও জানে না যে, কেউ যদি কাউকে বলে ঃ আমি স্বপ্নে একটি ভেড়া দেখেছি, যাকে মানুষ মহামারী বলে। ভেড়াটি পরে যবাহ হয়ে গেছে। একথা শুনে শ্রোতা জওয়াব দিল ঃ তুমি চমৎকার স্বপ্ন দেখেছ। মনে হয়, মহামারী খতম হয়ে যাবে। কেননা, যবাহ করা জন্তুর ফিরে আসা কল্পনাতীত। এখানে ব্যাখ্যাতাও সত্যবাদী এবং যে স্বপ্ন দেখেছে, সে-ও সত্যবাদী। আসলে স্বপ্ন দেখানো যে ফেরেশতার কাজ, সে নিদ্রিত ব্যক্তিকে "লওহে মাহফুযের" বিষয়টি দৃষ্টান্তের অনুরূপ বুঝিয়ে দিয়েছে। কেননা, নিদ্রিত ব্যক্তির পক্ষে দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝা সম্ভব ছিল না। এখন আমরা আসল উদ্দেশ্যের দিকে ফিরে আসছি। আমাদের উদ্দেশ্য এই যে, পাপ ও পুণ্যের ভিত্তিতে জান্নাত ও দোযখের স্তরসমূহের বিভাজন দৃষ্টান্ত ছাড়া বুঝা অসম্ভব। সুতরাং আমরা যে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করব, তা দ্বারা অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝে নিতে হবে, আকার ও শব্দের পেছনে পড়া যাবে না।

আখেরাতে মানুষের অনেক প্রকার হবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যে তাদের স্তর ও উপলব্ধির সীমাহীন তফাৎ হবে। যেমন, দুনিয়ার সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে তাদের তফাতের অন্ত নেই। এ ব্যাপারে দুনিয়া ও আখেরাতে কোন পার্থক্য নেই। কেননা, উভয় জগতের পরিচালক একমাত্র লা-শরীক আল্লাহ। তার চিরন্তন তরীকা ও পদ্ধতিও একই রকম। যেহেতু আমরা স্তরসমূহ গণনা করতে অক্ষম, তাই এগুলোর শ্রেণী সীমিত করে বর্ণনা করছি।

কিয়ামতের দিন মানুষ চার শ্রেণীতে বিভক্ত হবে। প্রথম ধ্বংসপ্রাপ্ত, দ্বিতীয় শাস্তিপ্রাপ্ত, তৃতীয় মুক্তিপ্রাপ্ত এবং চতুর্থ সফলকাম। দুনিয়াতে এর দৃষ্টান্ত এই যে, কোন বাদশাহ যুদ্ধ করে কোন দেশ জয় করলে তার অধিবাসীদের কতককে হত্যা করে— এরা প্রথম শ্রেণী, কতককে দীর্ঘকাল জেলে আটকে রাখে— এরা দ্বিতীয় শ্রেণী, কতককে ছেড়ে দেয়—এরা তৃতীয় শ্রেণী এবং কতককে পুরস্কৃত করে—এরা চতুর্থ শ্রেণী। বাদশাহ ন্যায়পরায়ণ হলে এসব আচরণ বিনা কারণে হবে না। হত্যা তাদেরকেই করবে, যারা তার অধিকারকে অস্বীকার করবে এবং তার বন্ধুর শত্রু হবে। জেলে তাদেরকে পাঠাবে— যারা তার আধিপত্য স্বীকার করবে; কিন্তু আনুগত্য ও খেদমতে ত্রুটি করবে। মুক্তি তাদেরকে দেবে, যারা কেবল তার বশ্যতা মেনে নেবে। পুরস্কৃত তাদেরকে করবে, যারা আজীবন তার খেদমত ও সহযোগিতায় দিনাতিপাত করবে। এরপর এটাও জরুরী যে, যে যেরূপ খেদমত করবে, সে অনুপাতেই সে পুরস্কার পাবে। হত্যাও বিভিন্ন প্রকার বের হবে। কারও শুধু গর্দান নেয়া হবে এবং কাউকে নাক, কান ও হাত-পা কেটে হত্যা করা হবে। অর্থাৎ অস্বীকারের স্তর অনুযায়ী হত্যাও বিভিন্ন স্তর হবে। অনুরূপভাবে যাদেরকে জেল দেয়া হবে, তাদেরও বিভিন্ন স্তর হবে— কাউকে কম সময়ের এবং কাউকে বেশী সময়ের। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর অসংখ্যা ও অগণিত হতে পারে।

অনুরূপভাবে কিয়ামতে এই চার শ্রেণীর স্তর অসংখ্য হবে। উদাহরণতঃ চতুর্থ শ্রেণী যারা সফলকাম হবে, তাদের কেউ জান্নাতে আদনে, কেউ জান্নাতে মাওয়ায় এবং কেউ জান্নাতুল ফেরদাউসে দাখিল হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত

শ্রেণীর মধ্যে কেউ অল্পদিন, কেউ হাজার বছর এবং কেউ সাত হাজার বছর শাস্তি ভোগ করবে। এরা সকলের পেছনে দোযখ থেকে বের হবে।

এখন আমরা প্রত্যেক শ্রেণীর স্তর বিভাজন বর্ণনা করার প্রয়াস পাব। প্রথম শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্তদের। তারা সে লোক, যারা আল্লাহর রহমত প্রার্থনা করে না। কেননা, উল্লিখিত দৃষ্টান্তে বাদশাহর কাছে তারাই হত্যাযোগ্য ছিল, যারা বাদশাহের সন্তুষ্টি, সম্মান ও পুরস্কার প্রার্থনা করত না। বলা বাহুল্য, এটা হচ্ছে কাফেরদের শ্রেণী। তারা আল্লাহর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কেবল দুনিয়ার পূজারী হয়ে থাকে এবং আল্লাহ, তাঁর রসূল ও ঐশী গ্রন্থসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা, আল্লাহর নৈকট্যশীল হওয়া এবং তাঁর দীদারের গৌরব অর্জন করাই হচ্ছে পারলৌকিক সৌভাগ্য। ঈমান ব্যতীত এই নেয়ামত অর্জন করা সম্ভব নয়। কাফেররা এটা অস্বীকার করে। তাই তারা এই নেয়ামত থেকে চিরতরে বঞ্চিত থাকবে।

দ্বিতীয় শ্রেণী শাস্তিপ্রাপ্তদের। তারা সেই লোক, যারা মূলত ঈমানদার; কিন্তু ঈমান অনুযায়ী আমলে ত্রুটি করে। উদাহরণতঃ তারা ঈমান রাখে যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও এবাদত করা যাবে না। এখন যদি কেউ আপন প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তবে তার উপাস্য সেই প্রবৃত্তিই হবে। সে কেবল মুখে মুখে তাওহীদ বলে। সত্যিকার তাওহীদ তার মধ্যে নেই। সত্যিকার তাওহীদ তখন হবে, যখন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলার পর আল্লাহ ব্যতীত সবকিছু পরিত্যাগ করে এবং সরল পথে কায়েম থাকে, যা এই আয়াতে বর্ণিত হয়েছে—

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা বলে, আমাদের রব আল্লাহ, এরপর সুদৃঢ় থাকে।

প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সরলপথ থেকে কিছু না কিছু বিচ্যুতি অবশ্যই রয়েছে। কারণ, প্রত্যেকেই প্রবৃত্তির অনুসরণ অবশ্যই করে— যদিও তা সামান্য ব্যাপারে হয়। ফলে, নৈকট্যের স্তরেও ত্রুটি দেখা দেয়। সুতরাং প্রত্যেকেরই শাস্তি হবে। কিন্তু এই শাস্তির তীব্রতা ও স্বল্পতা ঈমানের শক্তি এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ কমবেশী হওয়ার উপর নির্ভরশীল হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِنْ مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَّنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ـ

অর্থাৎ, তোমাদের প্রত্যেকেই সেটা অতিক্রম করবে। এটা তোমার পালনকর্তার অনিবার্য সিদ্ধান্ত। এরপর আমি খোদাভীরুদেরকে উদ্ধার করব এবং যালেমদেরকে সেথায় নতজানু অবস্থায় রেখে দেব।

এ কারণেই আগেকার দিনের বুযুর্গগণ ভয় করতেন এবং বলতেন ঃ আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী দোযখভোগ নিশ্চিত এবং রক্ষা পাওয়া সন্দেহযুক্ত। এটাই আমাদের ভয়ের কারণ। হাদীসদৃষ্টে জানা যায়, সকলের শেষে যে ব্যক্তি দোযখ থেকে বের হবে, সে সাত হাজার বছর পরে বের হবে। কেউ কেউ মুহূর্তের মধ্যে দোযখের ওপারে চলে যাবে। কেউ বিদ্যুৎ গতিতে চলে যাবে। তাদের এক দণ্ডও দোযখে অবস্থান করতে হবে না। এক দণ্ড এবং সাত হাজার বছরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন অনেক স্তর রয়েছে।

এখন আমরা বলছি, যে ব্যক্তি মূল ঈমানকে শক্তিশালী করে সকল কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে, সকল ফরয কর্ম অর্থাৎ পাঞ্জেগানা নামায উত্তমরূপে আদায় করবে এবং মাত্র কয়েকটি সগীরা গোনাহই তার যিম্মায় থাকবে, যা সে উপর্যুপরি করেনি, মনে হয় তার কেবল হিসাবই নেয়া হবে— কোন প্রকার আযাব হবে না। হিসাবের সময় তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে। কেননা, হাদীসে বর্ণিত আছে, পাঞ্জেগানা নামায, জুমআ এবং রমযানের রোযা মধ্যবর্তী সকল গোনাহের জন্যে কাফফারা হয়ে যায়। কবীরা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা যে সগীরা গোনাহের জন্যে কাফফারা হয়ে যায়, একথা কোরআনের আয়াত দ্বারাই প্রমাণিত। কাফফারা হওয়ার সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে হিসাব রোধ করতে না পারলেও আযাব রোধ করা। সুতরাং এরূপ ব্যক্তি হিসাব শেষ হওয়ার পর সুখে থাকবে।

যে ব্যক্তি একটি অথবা বেশী কবীরা গোনাহ করে এবং ফরয কর্মও কতক বর্জন করে, সে মৃত্যুর পূর্বে খাঁটি তওবা করলে এমন হয়ে যাবে, যেমন সে কোন গোনাহই করেনি। আর যদি তওবার পূর্বে মারা যায়, তবে

মৃত্যুর সময় তার অবস্থা আশংকাজনক হবে। উপর্যুপরি গোনাহ করা অবস্থায় মারা গেলে তার ঈমান না থাকা বিচিত্র নয়।

তৃতীয় শ্রেণী মুক্তিপ্রাপ্তদের। তারা সেই লোক, যারা কেবল আযাব থেকে বেঁচে যাবে। তারা কোন খেদমত করেনি তাই পুরস্কার পাবে না এবং কোন দোষও করেনি তাই আযাবও হবে না। এ অবস্থা কাফেরদের মধ্য থেকে উন্মাদ, বালক ও অজ্ঞানদের হবে এবং সেসব লোকের হবে, যাদের কাছে জনপদ থেকে আলাদা থাকার কারণে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি। এরূপ লোকেরা না আল্লাহকে জানে, না তাঁকে অস্বীকার করে। ফলে, এবাদত ও গোনাহ কিছুই করে না। একারণেই তারা জান্নাতেও থাকবে না এবং দোযখেও যাবে না; বরং জান্নাত ও দোযখের মধ্যবর্তী এক জায়গায় অবস্থান করবে, যাকে শরীয়তের পরিভাষায় "আ'রাফ" বলা হয়। এটা কোরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত। তবে বিশেষ কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয় যে, তারাও অকাট্যরূপে আ'রাফে থাকবে—এটা অনিশ্চিত; যেমন কাফেরদের বালকদের আ'রাফে থাকা অকাট্য নয়। কারণ বালকদের ব্যাপারে হাদীসও বিভিন্নরূপ বর্ণিত রয়েছে। একবার জনৈক বালক মারা গেলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বললেন ঃ সে জান্নাতের পাখীদের অন্যতম। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিরূপে জানলে? এতে ব্যাপারটি অস্পষ্ট হয়ে গেল।

চতুর্থ শ্রেণী সফলকামদের। তারা সে লোক, যারা অনুকরণ ছাড়াই আল্লাহ তা'আলাকে চিনে নেয়। তারাই নৈকট্যশীল ও অগ্রগামী। তারা বর্ণনাতীত নেয়ামত ও সম্ভোগপ্রাপ্ত হবে। এ সম্পর্কে কোরআনে যা উল্লিখিত হয়েছে, তাই বর্ণনা করা যায়। আল্লাহর বর্ণনার অধিক কে কি বলবে? যেহেতু এ জগতে এর বিস্তারিত বর্ণনা অসম্ভব, তাই আল্লাহ তা'আলা সংক্ষেপে বলে দিয়েছেন ঃ

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

অর্থাৎ, তাদের চক্ষু শীতল হওয়ার জন্য আল্লাহ তাদের জন্যে যা যা গোপন রেখেছেন, তা কেউ জানে না।

এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اعددت لعبادى الصالحين مالاعين رات ولا اذن سمعت ولاخطر على قلب بشر -

অর্থাৎ, আমি আমার সৎকর্মপরায়ণ বান্দাদের জন্যে এমন বস্তু প্রস্তুত রেখেছি, যা কোন চক্ষু দেখেনি, কোন কর্ণ শুনেনি এবং কোন মানুষের কল্পনায় উদয় হয়নি।

খোদাপ্রেমিকদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সে অবস্থাই হয়, যা এ জগতে কোন মানুষের কল্পনায় আসতে পারে না। জান্নাতের হুর, প্রাসাদ, ফলমূল, দুধ, মধু, পানীয়, কংকন ও অলংকারের প্রতি তাদের আদৌ কোন মোহ থাকে না। তাদেরকে এসব বস্তু দেয়া হলে তারা এতেই সন্তুষ্ট থাকবে না; বরং দীদার তথা আল্লাহকে দেখার আনন্দ লাভ করার জন্যে তারা উদগ্রীব থাকবে, যা হবে চূড়ান্ত সৌভাগ্য ও অপার আনন্দ। একারণেই হযরত রাবেয়া বসরীকে যখন জিজ্ঞেস করা হল, জান্নাতে আপনার ঔৎসুক্য কি হবে? তখন তিনি বললেন ঃ প্রথমে গৃহকর্তা, এরপর গৃহ। মোটকথা, খোদাপ্রেমিকদের অন্তর গৃহকর্তা অর্থাৎ আল্লাহ পাকের মহব্বতেই ডুবে থাকে। গৃহ অর্থাৎ জান্নাতের সাজ-সজ্জার প্রতি তাদের মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এমনকি, এই মহব্বতের কারণে তারা নিজেদের সম্পর্কেও বেখবর থাকে। ফলে, দৈহিক কষ্ট অনুভব করে না। এ অবস্থাকে বলা হয় "ফানা ফিল মাহবুব" (প্রেমাস্পদে লীন)।

সগীরা গোনাহ কিরূপে কবীরা হয়ে যায় ঃ জানা উচিত যে, সগীরা গোনাহ কয়েকটি কারণে কবীরা হয়ে যায়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে অব্যাহতভাবে করে যাওয়া। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, কোন গোনাহ অব্যাহতভাবে করা হলে তা সগীরা নয় এবং যে কোন গোনাহ এস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) সহকারে করা হলে তা কবীরা নয়। এর সারমর্ম এই যে, যদি কোন ব্যক্তি একটি কবীরা গোনাহ করে বিরত থাকে এবং অন্য কবীরা গোনাহ না করে, তবে এতে ক্ষমা পাওয়ার আশা অধিক সেই সগীরা গোনাহের তুলনায়— যা অব্যাহতভাবে করা হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ যদি শক্ত

পাথরের উপর এক এক ফোঁটা পানি অব্যাহতভাবে পতিত হতে থাকে, তবে এক সময়ে পাথরে চিহ্ন দেখা দেবে। পক্ষান্তরে যদি সকল ফোঁটার পানি একত্রিত করে এক সাথে সেই পাথরের উপর ঢেলে দেয়া হয়, তবে কোন চিহ্ন দেখা দেবে না। অব্যাহতভাবে করার এই প্রভাবের প্রতি লক্ষ্য করেই রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন।

خَيْرُ الْاَعْمَالِ اَدْوَمُهَا وَاِنْ قَلَّ

অর্থাৎ, সর্বোত্তম আমল তাই, যা অব্যাহতভাবে করা হয়— যদিও তা পরিমাণে কম হয়।

এ হাদীস থেকে জানা গেল যে, স্থায়ী আমল কম হলেও উপকারী। এর বিপরীতে আরও জানা গেল যে, অনেক আমল যা মানুষ একবারে করে নেয়, তা অন্তরের পবিত্রতায় কম উপকারী হয়ে থাকে। এমনিভাবে সগীরা গোনাহ যদি অব্যাহতভাবে করা হয়, তবে তা অন্তরকে মলিন ও তমসাচ্ছন্ন করার ব্যাপারে অধিক প্রভাবশালী হবে। তবে একথা ঠিক যে, অগ্রে ও পশ্চাতে সগীরা গোনাহ না করে সহসাই কবীরা গোনাহ করার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। উদাহরণতঃ হত্যাকারী সহসাই কাউকে হত্যা করে না যে পর্যন্ত পূর্ব থেকে শত্রুতা না হয়। এমনিভাবে প্রত্যেক কবীরা গোনাহ করার মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে শুরুতে ও শেষে সগীরাও করা হয়। যদি কোন ক্ষেত্রে সগীরা ব্যতিরেকেই সহসা কবীরা গোনাহ হয়ে যায় এবং পুনর্বার তা না করা হয়, তবে সম্ভবত এই কবীরা গোনাহ মাফ হওয়ার আশা সেই সগীরার তুলনায় বেশী, যা আজীবন করা হয়।

সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যাওয়ার আরও একটি কারণ হচ্ছে গোনাহকে ছোট মনে করা। কেননা, এটাই নিয়ম যে, মানুষ নিজের গোনাহকে যত বড় মনে করবে, আল্লাহ তা'আলার কাছে তা ততই ছোট হবে এবং গোনাহকে যত সগীরা মনে করবে, তা ততই কবীরা হবে। কারণ, গোনাহকে বড় মনে করা এ বিষয়ের প্রমাণ যে, অন্তরে গোনাহের প্রতি বিতৃষ্ণা ও ঘৃণা বিদ্যমান রয়েছে। ফলে, অন্তরে এর প্রভাব বেশী হয় না। পক্ষান্তরে গোনাহকে ছোট মনে করলে বুঝা যায়, অন্তরে এর প্রতি টান রয়েছে। এ কারণেই অন্তরে এর প্রভাব বেশী হয়। আর এ কারণেই

মানুষ অসাবধানতায় কোন পাপ করে ফেললে তজ্জন্য পাকড়াও করা হয় না। কেননা, এ অবস্থায় অন্তর প্রভাবিত হয় না।

হাদীস শরীফে আছে, ঈমানদার ব্যক্তি তার গোনাহকে এমন মনে করে— যেন মাথার উপর একটি পাহাড় এসে গেছে এবং এক্ষণি তা মাথার উপর পড়ে যাবে। পক্ষান্তরে মুনাফিক তার গোনাহকে এমন মনে করে— যেন নাকের ডগায় মাছি বসেছে এবং তাকে উড়িয়ে দিয়েছে। ঈমানদারের অন্তরে গোনাহের এই গুরুত্বের কারণ এই যে, সে আল্লাহ তা'আলার প্রতাপ সম্পর্কে সম্যক অবগত। যখন সে চিন্তা করে যে, এই গোনাহের মাধ্যমে সে কার অবাধ্যতা করেছে, তখন সগীরা গোনাহও তার দৃষ্টিতে কবীরা প্রতিভাত হয়। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা কোন এক নবীকে এই ওহী প্রেরণ করেন যে, উপঢৌকন কম—এদিকে লক্ষ্য করো না, বরং দেখ, যে প্রেরণ করেছে, সে কতটুকু মহান। তোমার পাপ ছোট—এদিকে দেখো না, বরং ভেবে দেখ, এ পাপ করে তুমি কার মোকাবিলা করেছ? এদিক দিয়েই জনৈক সাধক বলেন ঃ সগীরা গোনাহের কোন অস্তিত্বই নেই। যে বিষয়ে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা হয়, তা কবীরা-ই বটে।

সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যাওয়ার আরেকটি কারণ হচ্ছে গোনাহ করে উল্লসিত হওয়া এবং গর্ব করা। অতএব, মানুষ সগীরা গোনাহের যত বেশী স্বাদ পাবে, ততই তা কবীরা হবে। অন্তরকে তমসাচ্ছন্ন করার ব্যাপারে তার প্রভাবও বেশী হবে। এমনকি, কতক গোনাহগার তাদের গোনাহের জন্যে বাহবা পেতে চায় এবং গোনাহ করে খুব আস্ফালন করে। উদাহরণতঃ কোন কোন ব্যবসায়ী বলে— দেখ, আমি খারাপ মাল কিভাবে চালিয়ে দিলাম এবং ক্রেতাকে ধোকা দিয়ে দিলাম। বলা বাহুল্য, এসব কারণে সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়।

আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সময় দেয়া ও সহ্য করাকে তাঁর অনুগ্রহ মনে করে নিলেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। এই অনুগ্রহ মনে করার কারণে গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ বর্জন করতে অলসতা করে। সে জানে না যে, এই সময় দেয়ার পেছনে আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আরও বেশী গোনাহ করে নিক। সুতরাং বাস্তবে যা ক্রোধের কারণ, তাকেই অনুগ্রহের কারণ মনে করে নেয়া হয়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

وَيَقُوْلُوْنَ فِىْٓ اَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيْرُ.

অর্থাৎ, তারা মনে মনে বলে ঃ আমাদের কথার কারণে আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেন না কেন? তাদের জন্যে জাহান্নাম যথেষ্ট। তারা তাতে প্রবেশ করবে। এটা অত্যন্ত মন্দ জায়গা।

গোনাহ করে তা বলে বেড়ানো অথবা অপরের সামনে গোনাহ করার কারণেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। কেননা, এতে প্রথমত, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে গোপন রাখা হয়, তা ভেঙ্গে দেয়া হয়। দ্বিতীয়ত, অপরকে এ গোনাহের প্রতি উৎসাহিত করা হয়। ফলে, এক গোনাহের মধ্যে যেন দু'গোনাহ হয়ে যায়। হাদীসে বর্ণিত আছে, সকল মানুষের দোষ মার্জনা করা হবে; কিন্তু যারা গোনাহ করে ফাঁস করে দেয়, তাদেরকে ক্ষমা করা হবে না। অর্থাৎ কেউ রাতের বেলায় দোষ করল, যা আল্লাহ তা'আলা গোপন রাখলেন। কিন্তু সকালে গাত্রোত্থান করে সে আল্লাহর পর্দাকে ছিন্ন করল এবং আপন গোনাহ প্রকাশ করে দিল। এরূপ ব্যক্তির দোষ মার্জনা করা হবে না। গুণ প্রকাশ করা, দোষ গোপন করা এবং গোপন বিষয় ফাঁস না করা বান্দার প্রতি আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নেয়ামত। যে ব্যক্তি নিজের দোষ প্রকাশ করে দেয়, সে এই নেয়ামতের নাশোকরী করে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ প্রথমত, মানুষের কোন গোনাহ না করা উচিত। যদি করেও, তবে অপরকে উৎসাহিত না করা উচিত।

গোনাহগার ব্যক্তি আলেম ও অনুসৃত হলেও সগীরা গোনাহ কবীরা হয়ে যায়। আলেম ব্যক্তি যখন কোন সগীরা গোনাহ করে এবং তার অনুসরণে অন্যরাও তা করতে থাকে, তখন এ গোনাহ আলেম ব্যক্তির জন্যে কবীরা হয়ে যাবে। উদাহরণতঃ রেশমী বস্ত্র পরিধান করা, সন্দেহযুক্ত ধনসম্পদ গ্রহণ করা, শাসকবর্গের কাছে আসা-যাওয়া করা, তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করা এবং মুসলমানের মর্যাদাহানি করা ইত্যাদি। মানুষ আলেমের এ ধরনের দোষের সনদ পেশ করে থাকে। আলেম মরে যায়। কিন্তু তার অনিষ্ট অব্যাহত থাকে। বলা বাহুল্য, যে ব্যক্তির সাথে সাথে তার পাপও

মরে যায়, সে চমৎকার ব্যক্তি। হাদীসে আছে— যে ব্যক্তি কুপ্রথা চালু করে, সে নিজে সেই কাজ করার জন্যে গোনাহগার হবে এবং অন্য যারা এ কাজ করবে, তাদের পাপও তার উপর বর্তাবে এমতাবস্থায় যে, তাদের পাপ হ্রাস করা হবে না। অর্থাৎ যারা করবে তাদের পাপ আলাদা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ

অর্থাৎ, আমি সেই আমল লিখি, যা তারা অগ্রে পাঠায় এবং সেই আমল, যার চিহ্ন তাদের পেছনে থাকে।

এখানে "পেছনের চিহ্ন" বলে সেই আমলকে বুঝানো হয়েছে, যা আমলকারীর মৃত্যুর পরও অব্যাহত থাকে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ আলেমের দুর্ভোগ অপরের অনুসরণের কারণে হয়ে থাকে। সে ভুল করলে তওবা করে নেয়; কিন্তু মানুষ এরপরও তার অনুসরণ করতে থাকে এবং কাজটিকে ছড়াতে থাকে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আলেমের দোষ নৌকা ভেঙ্গে যাওয়ার মত। এতে নৌকা নিজেও নিমজ্জিত হয় এবং যাত্রীদেরকেও ডুবিয়ে দেয়। বনী ইসরাঈলের জনৈক আলেম মানুষকে বেদআত শিক্ষা দিয়ে গোমরাহ করত। পরবর্তীতে তার তওবা নসীব হয় এবং সে দীর্ঘকাল পর্যন্ত মানুষের সংস্কারে নিয়োজিত থাকে। আল্লাহ তা'আলা সমসাময়িক পয়গম্বরের কাছে এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তাকে বলে দাও, যদি তুমি কেবল আমারই দোষ করতে, তবে আমি তোমাকে মাফ করে দিতাম। কিন্তু তুমি তো বহু মানুষকে গোমরাহ করেছ, যে কারণে আমি তাদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করেছি।

এ থেকে বুঝা গেল, আলেমদের দুটি বিষয় করা উচিত। প্রথমত, তারা মূলতই গোনাহ বর্জন করবে। দ্বিতীয়ত, যদি গোনাহ হয়ে যায়, তবে তা প্রকাশ করবে না। আলেমদের গোনাহের শাস্তি যেমন বেশী হয়, তেমনি তাদের পুণ্যকর্মের সওয়াবও অন্যদের অনুসরণের কারণে বেশী হয়। উদাহরণতঃ যদি আলেম বাহ্যিক সাজসজ্জা ও দুনিয়ার মোহ বর্জন করে এবং অল্প দুনিয়া নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে, তার এই রীতি অন্যরাও অবলম্বন করে, তবে অন্যরা যে পরিমাণ সওয়াব পাবে, তার সমস্তই সে-ও পাবে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পূর্ণাঙ্গ তওবা ও তার শর্তাবলী

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, তওবা সেই অনুশোচনাকে বলা হয়, যার ফলস্বরূপ সংকল্প অস্তিত্ব লাভ করে। নিজের এবং প্রেমাস্পদের মাঝে গোনাহের প্রাচীর খাড়া হওয়ার জ্ঞান হচ্ছে এই অনুশোচনার কারণ। সুতরাং তওবার অংশ হচ্ছে জ্ঞান, অনুশোচনা ও সংকল্প। এই অংশত্রয়ের প্রত্যেকটির জন্যে রয়েছে পূর্ণাঙ্গতার পরিচয় ও স্থায়িত্বের শর্তাবলী। এগুলো বর্ণনা করা জরুরী। জ্ঞানের বর্ণনা হচ্ছে তওবার কারণ বর্ণনার নামান্তর, যা পরে উল্লিখিত হবে। এখানে প্রথমে অনুশোচনা বলা হয় অন্তরের ব্যথাকে, যা প্রেমাস্পদকে হারানোর সংবাদ শুনে সৃষ্টি হয়। এর পরিচয় হচ্ছে অত্যধিক দুঃখ ও বেদনা হওয়া, অশ্রু বিসর্জন করা এবং প্রচুর কান্নাকাটি করা; যেমন কেউ আপন সন্তান অথবা কোন প্রিয়জনের বিপদ সম্পর্কে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে এবং প্রচুর কান্নাকাটি করে।

এখন প্রশ্ন হল নিজের প্রাণের চেয়ে অধিক প্রিয় আর কি, জাহান্নামের অগ্নির চেয়ে বড় বিপদ আর কি এবং গোনাহের চেয়ে বেশী আযাব নাযিল হওয়ার প্রমাণ কোন্‌টি? বরং একজন মানুষ যাকে চিকিৎসক বলা হয়, সে যদি কোন ব্যক্তিকে বলে দেয়, তোমার পুত্র দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে এবং সে অতিসত্বর মারা যাবে, তবে তৎক্ষণাৎ সে দুঃখ ভারাক্রান্ত হয়ে পরে এবং কান্নাকাটি শুরু করে দেয়। অথচ পুত্র প্রাণাধিক প্রিয় নয় এবং ডাক্তারও আল্লাহ ও রসূলের চেয়ে অধিক জ্ঞানী ও সত্যবাদী নয়। এ থেকে জানা গেল যে, মানুষের উচিত নিজের দুরবস্থার জন্যে অধিক দুশ্চিন্তা ও দুঃখ করা। দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও অনুতাপ যত বেশী হবে, সে পরিমাণে গোনাহ দূর হওয়ার আশা করা যাবে। মোটকথা, অন্তরের বিনম্রতা এবং অশ্রুপাত হল বিশুদ্ধ অনুশোচনার লক্ষণ। হাদীসে বর্ণিত আছে, তওবাকারীদের সংসর্গ অবলম্বন কর। তাদের অন্তর খুব নরম থাকে।

অন্তরে গোনাহের স্বাদের পরিবর্তে তিক্ততা প্রতিষ্ঠিত হওয়াও অনুশোচনার একটি লক্ষণ। বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি

গোনাহ করার পর অনেক বছর পর্যন্ত এবাদতে মশগুল থাকে। কিন্তু তওবা কবুল হওয়ার কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না। অগত্যা সে সমসাময়িক পয়গম্বরের কাছে সুপারিশ প্রার্থী হল। পয়গম্বর আল্লাহর দরবারে তার জন্য দোয়া করলেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন ঃ আমার ইযযত ও প্রতাপের কসম, যদি ভূ-পৃষ্ঠের সকলেই তার জন্যে সুপারিশ করে, তবু আমি তার তওবা কবুল করব না— যতক্ষণ পর্যন্ত যে গোনাহ থেকে সে তওবা করেছে, তার স্বাদ তার অন্তরে থাকবে।

এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে, গোনাহ স্বাভাবিকভাবেই মানুষের কাছে সুস্বাদু হয়ে থাকে। সুতরাং এর তিক্ততা অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হবে কিরূপে? জওয়াব এই যে, মনে কর কেউ বিষ মিশ্রিত মধু পান করল। অধিক মিষ্ট হওয়ার কারণে সে পান করার সময় বিষ টের পেল না। এরপর সে অসুস্থ হয়ে পড়ল, চুল বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল এবং সর্বাঙ্গ শক্ত হয়ে গেল। এখন যদি কেউ তার সামনে পূর্ববৎ বিষ মিশ্রিত মধু পেশ করে এবং সেও চরম ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত হয়, তবে সে এই মধুকে ঘৃণা করবে কি না? যদি বল করবে না তবে এটা অভিজ্ঞতার পরিপন্থী। নিয়ম এই যে, এহেন কষ্ট ভোগ করার পর যদি কেউ খাঁটি মধুও পেশ করে, তবে একরূপ রঙ দেখে তা-ও প্রত্যাখ্যান করবে। কথায় বলে চুন খেয়ে মুখ পুড়লে দৈ দেখলেও ভয় লাগে। অতএব, তওবাকারী ব্যক্তি অন্তরে গোনাহের যে তিক্ততা অনুভব করে, তাও এমনিভাবে বুঝা দরকার। প্রথমে সে জানে, প্রত্যেক গোনাহের স্বাদ মধুর মত মিষ্ট। কিন্তু তার প্রতিক্রিয়া বিষের অনুরূপ। এরূপ বিশ্বাস না হওয়া পর্যন্ত তওবা খাঁটি ও সাচ্চা হয় না। কিন্তু এরূপ বিশ্বাস খুব বিরল। তাই তওবা এবং তওবাকারীও বিরল। সকলেরই এক অবস্থা। তারা আল্লাহর প্রতি বিমুখ এবং গোনাহে অবিচল।

এখন সংকল্প সম্পর্কে বলা যাক। এটা অনুশোচনা থেকে উৎপন্ন হয় এবং তিনটি কালের সাথেই এর সম্পর্ক। বর্তমানকালে সংকল্পের অর্থ এই যে, যে নিষিদ্ধ কাজ করে যাচ্ছে, তা বর্জন করবে এবং যে ফরয কর্ম করার উদ্যোগ নিয়েছে, তা তখনই আদায় করে নেবে। অতীতকালে সংকল্পের মানে এই যে, পূর্বে যে ত্রুটি হয়ে গেছে, তা পূরণ করবে। ভবিষ্যতকালে সংকল্পের উদ্দেশ্য হল মৃত্যু পর্যন্ত এবাদত-বন্দেগী অব্যাহত রাখবে এবং গোনাহ বর্জন করবে।

অতীতকালের সাথে সম্পর্কের দিক দিয়ে তওবা বিশুদ্ধ হওয়ার শর্ত এই যে, চিন্তা করে বের করবে কোন্ দিন সে বালেগ হয়েছিল। এটা জানা হয়ে গেলে সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত যতটুকু বয়স হয়েছে, তার এক এক বছর, মাস ও দিনের মধ্যে খোঁজ করে দেখবে কোন্ এবাদতে সে ত্রুটি করেছে অথবা কি পরিমাণ গোনাহ করেছে। যদি জানা যায় যে, কতক নামায সে পড়েনি, তবে সেই নামাযের কাযা পড়বে। এরূপ নামাযের সঠিক সংখ্যা জানা না গেলে বালেগ হওয়ার দিন থেকে হিসাব করে যে পরিমাণ নামায নিশ্চিতরূপে আদায় করা হয়েছে, সেগুলো বাদ দিয়ে অবশিষ্ট নামাযের কাযা পড়বে। এরূপ নামাযের সংখ্যা আন্দাজ করে নেয়াও জায়েয। রোযার ক্ষেত্রেও এভাবে আন্দাজ করে নেবে, কয়টি রোযা রাখা হয়নি। এরপর সেগুলোর কাযা করে নেবে। যাকাত না দিয়ে থাকলে নিজের সমস্ত ধন-সম্পদকে দেখবে, কবে থেকে তার মালিকানায় এসেছে। তবে এতে বালেগ হওয়ার শর্ত নেই। কেননা, নাবালেগের মালেও যাকাত ফরয হয়। অতঃপর হিসাব করে প্রবল ধারণা অনুযায়ী যে পরিমাণ যাকাত ওয়াজিব হবে, তা আদায় করে দেবে। এ হচ্ছে এবাদতে খোঁজাখুঁজি করে ত্রুটি জানা ও তা পূরণ করার পদ্ধতি।

গোনাহের ক্ষেত্রে উপায় এই যে, বালেগ হওয়ার শুরু থেকে তওবার দিন পর্যন্ত নিজের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গোনাহ দিন ও ঘন্টায় চিন্তা করবে এবং পৃথক পৃথক গোনাহ সম্পর্কে অবগতি লাভ করবে। এরপর দেখবে এসব গোনাহের কোন্ কোন্টি আল্লাহর হক সম্পর্কিত এবং কোন্ কোন্টি বান্দার হক সম্পর্কিত। যে সকল গোনাহ্ আল্লাহর হক সম্পর্কিত, সেগুলো থেকে তওবার উপায় হচ্ছে দুঃখ ও অনুতাপ করা এবং প্রত্যেক গোনাহের বিনিময়ে সৎকর্ম করা। এমতাবস্থায় যে পরিমাণ গোনাহ হবে, সে পরিমাণে সৎকর্ম করতে হবে। কারণ, হাদীসে আছে—তুমি যেখানেই থাক, আল্লাহকে ভয় কর এবং গোনাহের পশ্চাতে সৎকর্ম সম্পাদন কর; বরং কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ

অর্থাৎ, সৎকর্ম পাপকে মিটিয়ে দেয়।

এই বিনিময়ের কয়েকটি দৃষ্টান্ত এই যে, যদি কেউ বাদ্যযন্ত্র শুনে থাকে, তবে তার বিনিময়ে ততক্ষণ কোরআন, ওয়ায অথবা যিকর শুনবে। মসজিদে নাপাক অবস্থায় বসে থাকলে, ততক্ষণ এতেকাফের নিয়তে বসে এবাদতে মশগুল হবে। উযু ছাড়া কোরআন মজীদ স্পর্শ করে থাকলে তার সম্মান করবে, অধিক পরিমাণে তেলাওয়াত করবে এবং চুম্বন করবে। মদ্যপান করে থাকলে হালাল উপার্জনের শরবত সদকা করবে। উদ্দেশ্য এই যে, প্রত্যেক গোনাহের বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা সেই গোনাহের বিপরীত সৎকর্মের আলো ছাড়া দূর হবে না। উদাহরণতঃ কাল রঙ দূর করতে হলে সাদা রঙ প্রয়োগ করতে হবে। উত্তাপ ও শৈত্য দ্বারা তা দূর হবে না। গোনাহ দূর করার জন্যে এ পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ ও সহজ– যদিও এক প্রকার এবাদত অব্যাহতভাবে করতে থাকলেও কিছুটা ফল লাভের আশা আছে। বিপরীত পদ্ধতি দ্বারা গোনাহ দূর হওয়ার কারণ এই যে, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল শিকড়। দুনিয়ার অনুগামী হওয়ার প্রভাবে অন্তর দুনিয়ার প্রতি তুষ্ট থাকে এবং তৎপ্রতি আগ্রহান্বিত হয়। অতএব, মুসলমান ব্যক্তির উপর এমন বিপদ আসা জরুরী, যা দ্বারা তার অন্তর দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কেননা, দুঃখ ও বেদনার কারণে অন্তর দুনিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। এটাও তার জন্যে গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

হাদীসে আছে, কতক গোনাহের জন্য কেবল দুঃখ ও বেদনাই হয়ে থাকে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এরশাদ হয়েছে—যখন বান্দার গোনাহ বেশী হয়ে যায় এবং কাফফারার জন্যে আমল থাকে না, তখন আল্লাহ তা'আলা তাকে অনেক দুঃখ ও কষ্টে ফেলে দেন এবং এ দুঃখ-কষ্টই তার গোনাহের কাফ্ফরা হয়ে যায়।

এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, মানুষের দুঃখ-কষ্ট অধিকাংশ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও জাঁকজমকের কারণে হয়ে থাকে। এটা গোনাহ। সুতরাং গোনাহের কাফফারা গোনাহ কিরূপে হবে? এর জওয়াব এই যে, ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির মহব্বত গোনাহ এবং এগুলো থেকে বঞ্চিত থাকা এ গোনাহের বিনিময়। মহব্বতের চাহিদা অনুযায়ী ভোগ করলে পূর্ণ দোষী হত। বর্ণিত আছে, হযরত জিবরাঈল বন্দীশালায় হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে গমন করলে তিনি জিবরাঈলকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেই দরদী বৃদ্ধ অর্থাৎ হযরত এয়াকুব (আঃ)-কে কি অবস্থায় রেখে এসেছেন? জিবরাঈল (আঃ) বললেন ঃ তিনি আপনার জন্যে যে দুঃখ সয়েছেন, তা এমন একশ' জন মহিলার দুঃখের সমান, যাদের সন্তান মারা গেছে। তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ তিনি আল্লাহর কাছে এই দুঃখ-কষ্টের সওয়াব কি পরিমাণে পাবেন? উত্তর হল ঃ তিনি শহীদের অনুরূপ সওয়াব পাবেন। এ থেকে বুঝা গেল, দুঃখ-কষ্টও আল্লাহর হকের কাফ্ফারা হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে যে সকল গোনাহ বান্দার হক সম্পর্কিত, সেগুলোতেও আল্লাহ তা'আলার হক থাকে। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বান্দার সাথে যুলুম তথা অন্যায় আচরণ করতে নিষেধ করেছেন। অতএব, যে ব্যক্তি অপরের প্রতি যুলুম করে, সে প্রথমে আল্লাহ তা'আলার বিরোধিতা করে। এ ধরনের গোনাহে আল্লাহর হক পূরণ করার উপায় হচ্ছে অনুতাপ ও দুঃখ করা এবং ভবিষ্যতে এরূপ গোনাহ না করা। এ ছাড়া, এ ধরনের গোনাহের বিপরীত পুণ্যকাজ করা। উদাহরণতঃ কারও মনে কষ্ট দিয়ে থাকলে তার প্রতি অনুগ্রহ করা। কারও ধন-সম্পদ ছিনিয়ে থাকলে তার কাফফারা স্বরূপ নিজের হালাল ধন-সম্পদ খয়রাত করা। কারও গীবত ও তিরস্কার করে থাকলে তার প্রশংসা কীর্তন করা। কোন মানুষকে হত্যা করে থাকলে ক্রীতদাস মুক্ত করা। কেননা, এটাও এক ধরনের জীবন দান।

তবে বান্দার হক সম্পর্কিত গোনাহসমূহে কেবল অনুতাপ করা এবং বিপরীত সৎকর্ম করাই যথেষ্ট নয়; বরং এ ক্ষেত্রে বান্দার হক আদায় করাও জরুরী। যদি বান্দার হক প্রাণনাশের সাথে সম্পর্ক হয়, যেমন কাউকে ভুলক্রমে খুন করে থাকলে তার তওবা হচ্ছে রক্ত বিনিময় আদায় করা। প্রাপক ব্যক্তিবর্গকে রক্তবিনিময় না দেয়া পর্যন্ত খুনী ব্যক্তি অপরাধমুক্ত হবে না। আর যদি ইচ্ছাকৃতভাবে খুন করে থাকে, তবে এর তওবা "কেসাস" তথা খুনের বদলে খুন দ্বারাই গ্রহণীয় হবে। যদি হত্যার ব্যাপারটি অজানা থাকে, তবে হত্যাকারীর জন্যে ওয়াজিব নিহত ব্যক্তির ওলীর কাছে হত্যার কথা স্বীকার করা এবং আত্মসমর্পণ করা। এরপর সে ক্ষমা করুক অথবা হত্যার বদলে হত্যা করুক। এ ছাড়া, হত্যাকারী কিছুতেই পাপমুক্ত হবে না। এখানে হত্যার বিষয় গোপন করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। কিন্তু যিনা, চুরি, মদ্যপান ইত্যাদি আল্লাহর হক সম্পর্কিত গোনাহের ক্ষেত্রে তওবার জন্যে

গোপনীয়তা ফাঁস করা এবং শাস্তির জন্যে ওলীর কাছে আত্মসমর্পণ করা জরুরী নয়; বরং এসব ক্ষেত্রে ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহ যেমন গোপন রেখেছেন, তেমনি গোপন থাকতে দেয়া এবং নিজের শাস্তি নিজেই সাব্যস্ত করা। যেমন, পাপমোচনের জন্যে নানা রকম সাধনায় রত হওয়া। কেননা, আল্লাহর হক কেবল তওবা ও অনুতাপ দ্বারা মাফ হতে পারে। যদি এসব ক্ষেত্রে তওবাকারী আপন গোনাহ আদালতে পেশ করে শাস্তি গ্রহণ করে, তবে তওবা সঠিক ও যথার্থ হবে এবং আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মায়েয ইবনে মালেক (রাঃ) রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলেন ঃ আমি নিজের উপর ভয়ানক যুলুম করেছি। আমি যিনা করেছি। হুযুর, আমাকে পাপমুক্ত করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কথায় কর্ণপাত করলেন না। দ্বিতীয় দিন তিনি এসে আবারও সে কথার পুনরাবৃত্তি করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এবারও তার কথা কানে তুললেন না। যখন তৃতীয় দিন এসে একই কথা আরয করলেন, তখন রসূলে করীম (সাঃ) তার জন্যে গর্ত খনন করালেন এবং পাথর মেরে মেরে তার জীবনের অবসান ঘটালেন। তার সম্পর্কে মুসলমানরা দু'দলে বিভক্ত হয়ে গেল। এক দল বলছিল ঃ মায়েযের মৃত্যু পাপে পরিবেষ্টিত অবস্থায় হয়েছে। পক্ষান্তরে অপর দলের অভিমত ছিল মায়েযের তওবার মত খাঁটি কোন তওবা নেই। রসূলুল্লাহ (সাঃ) দ্বিতীয় দলের সমর্থন করে বললেন ঃ মায়েয এমন তওবা করেছে, যা সমগ্র উম্মতের মধ্যে বিভাজ্য হতে পারে।

অনুরূপভাবে খামেদিয়া মহিলার ঘটনাও সুবিদিত। সে রসূলে করীম (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ আমি যিনা করেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করুন। তিনি তার কথা শুনেও শুনলেন না। পরদিন সে আবার আরয করল ঃ আপনি আমাকে পবিত্র করেন না কেন? আপনি কি আমাকে মায়েযের মত মনে করেন? আল্লাহর কসম, আমার তো গর্ভও হয়ে গেছে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করলেন ঃ তোমার গর্ভস্থ সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে "হদ" তথা আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি দেয়া যাবে না। এরপর সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে সে তাকে একটি কাপড়ে জড়িয়ে উপস্থিত করল এবং আরয করল ঃ হুযুর! আমার সন্তান হয়ে গেছে। এবার

আমাকে শাস্তি দিয়ে পবিত্র করুন। রসূলে করীম (সাঃ) বললেন ঃ যাও, তোমার সন্তান যখন দুধ খাওয়া ছেড়ে দিবে, তখন দেখা যাবে। অতঃপর শিশুটি যখন দুধ খাওয়া ছেড়ে খাদ্য খেতে শুরু করল, তখন খামেদিয়া তাকে নিয়ে আবার উপস্থিত হল। শিশুর হাতে তখন একখণ্ড রুটি ছিল। খামেদিয়া আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! সে দুধ খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে এবং রুটি খেতে শুরু করেছে। রসূলে করীম (সাঃ) শিশুটিকে একজন মুসলমানের হাতে সমর্পণ করলেন এবং খামেদিয়ার জন্য গর্ত খনন করালেন। অতঃপর তাকে লক্ষ্য করে পাথর ছোঁড়ার জন্য মুসলমানদেরকে আদেশ দিলেন। খালেদ ইবনে ওলীদ এসে যখন তার মাথায় একটি পাথর ছুঁড়ে মারলেন, তখন রক্তের ছিটা এসে তার মুখমণ্ডলে পতিত হল। তিনি উত্তেজিত হয়ে খামেদিয়াকে গালি দিলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) তার গালি শুনে বললেন ঃ খালেদ গালি দিয়ো না। সেই আল্লাহর কসম, যার কবযায় আমার প্রাণ, এই মহিলা এমন তওবা করেছে যে, জরিমানা আদায়কারীর মত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি এরূপ তওবা করলে তারও মাগফেরাত হয়ে যাবে। (হাদীসে "মক্স" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ সেই জরিমানা, যা উশর আদায়কারী মানুষের কাছ থেকে গ্রহণ করত। এরূপ জরিমানা আদায়কারী সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, সে জান্নাতী হবে না।)

বান্দার হকসমূহের মধ্যে যদি কারও ধনসম্পদ চুরি, ডাকাতি, প্রতারণা, আত্মসাৎ, ঠকানো ইত্যাদির মাধ্যমে বিনষ্ট করে, তবে এ থেকে তওবা করার বিশেষ পদ্ধতি রয়েছে। এতে প্রাপ্তবয়স্ক ও অপ্রাপ্তবয়স্ক সকলেই সমান। অর্থাৎ সকলকেই তওবা করতে হবে। সুতরাং জীবনের শুরু থেকে তওবার দিন পর্যন্ত পাই পাই করে হিসাব করবে এবং দেখবে তার যিম্মায় কার কত পাওনা হয়েছে। এরপর এসব পাওনা নামে নামে লিপিবদ্ধ করবে এবং পাওনাদারদের খোঁজে বাড়ী থেকে বের হয়ে পড়বে। অতঃপর তাদের কাছ থেকে মাফ করিয়ে নেবে। অথবা যার যা পাওনা, তা শোধ করে দেবে। যদি যথাসাধ্য চেষ্টার পর সকল পাওনাদার অথবা তাদের ওয়ারিসদেরকে তালাশ করা সম্ভব না হয়, তবে বিপুল পরিমাণে সৎকর্ম করবে, যাতে কিয়ামতের দিন এসব সৎকর্মের সওয়াব দিয়ে পাওনাদারদের পাওনা শোধ করা যায়। সুতরাং মানুষের পাওনার পরিমাণ অনুযায়ী সৎকর্ম করা চাই। যদি সৎকর্ম দ্বারা সকল পাওনা শোধ না হয়, তবে

পাওনাদারদের গোনাহ তার উপর চাপিয়ে দেয়া হবে। ফলে, সে অপরের গোনাহের বদলে জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে। যদি কারও ধনসম্পদে হালাল ও হারাম মিশে যায়, তবে আন্দাজ করে হারাম মাল বের করে খয়রাত করে দেবে।

কুৎসা রটনা, গীবত ইত্যাদির মাধ্যমে অপরের মনে কষ্ট দিলে তার তওবা হল যাদের মনে কষ্ট দিয়ে থাকবে, তাদের প্রত্যেককে তালাশ করে মাফ করিয়ে নেয়া। যদি তাদের কেউ মারা গিয়ে থাকে অথবা নিরুদ্দেশ থাকে, তবে তার তওবা এ ছাড়া কিছুই নয় যে, পুণ্যকর্ম অনেক করবে, যাতে কিয়ামতে বিনিময়ে দিতে পারে; যাকে তালাশ করে পাওয়া যায়, সে যদি মনের খুশীতে মাফ করে দেয়, তবে এটা তার অপরাধের কাফফারা হয়ে যাবে। কিন্তু যে অপরাধ করেছে এবং মুখে যা যা বলেছে, তা মাফ চাওয়ার সময় বর্ণনা করা ওয়াজিব। অস্পষ্ট মাফ করানো যথেষ্ট হবে না। কেননা, এমনও হয় যে, নিজের উপর অপরের বাড়াবাড়ির কথা জানার পর মাফ করতে মন চায় না এবং কিয়ামতেই বিনিময় নেয়ার কথা চিন্তা করা হয়। তবে যদি এমন কোন অপরাধ করে থাকে, যা বর্ণনা করলে প্রতিপক্ষ মনে ব্যথা পাবে, তবে বুঝতে হবে মাফ করানোর পথ রুদ্ধ। তবে এটা সম্ভব যে, অস্পষ্ট মাফ করিয়ে নিবে এবং পরে যে ত্রুটি থেকে যাবে,তা পুণ্য কর্মের দ্বারা পূরণ করে নেবে। অপরাধ উল্লেখ করার পর প্রতিপক্ষ যদি মাফ করতে সম্মত না হয়, তবে শাস্তি অপরাধীর ঘাড়ে থেকে যাবে। কেননা, প্রতিপক্ষের হক এখনও বহাল রয়েছে। এমতাবস্থায় অপরাধীর উচিত তার সাথে নম্র ব্যবহার করা, তার খেদমত করা এবং তার প্রতি ভালবাসা ও সৌহার্দ প্রকাশ করা। এতে প্রতিপক্ষের মন তার প্রতি নরম হবে। কেননা, কথায় বলে, মানুষ অনুগ্রহের দাস। ফলে, শেষ পর্যন্ত সে মাফ করতে সম্মত হয়ে যাবে। যদি এরপরও মাফ না করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকে, তবে তার নম্রতা ও সদ্ব্যবহার মাঠে মারা যাবে না; বরং এগুলো পুণ্যকর্ম হয়ে যাবে, যা দ্বারা কিয়ামতে বিনিময় দেয়া যাবে।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে এক ব্যক্তি

৯৯টি খুন করেছিল। অতঃপর সে মানুষের কাছে জিজ্ঞেস করল ঃ বর্তমান যুগে সর্ববৃহৎ আলেম কে? লোকেরা বলল ঃ অমুক সন্ন্যাসী। সে তার কাছে গেল এবং বলল ঃ আমি ৯৯টি খুন করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি? সন্ন্যাসী জওয়াব দিল ঃ না। সে সন্ন্যাসীকেও হত্যা করে খুনের সংখ্যা একশতে উন্নীত করে নিল। সে পুনরায় লোকদেরকে জিজ্ঞেস করল ঃ এখন সেরা আলেম কে? লোকেরা জনৈক আলেমের নাম বললে সে তার কাছে গেল এবং বলল ঃ আমি একশ' জনকে হত্যা করেছি। আমার তওবা কবুল হবে কি না? আলেম বলল ঃ তওবা কবুল হওয়ার ব্যাপারে কোন বাধা নেই। যখনই তওবা করবে, কবুল হবে। তুমি অমুক জায়গায় যাও। সেখানে কিছু লোক আল্লাহর এবাদতে নিয়োজিত রয়েছে। তুমিও তাদের সাথে এবাদতে মগ্ন থাক এবং কখনও দেশে ফিরে যেয়ো না। লোকটি অর্ধেক পথ অতিক্রম করতেই মৃত্যু এসে তার সামনে উপস্থিত হল। তখন রহমত ও আযাবের ফেরেশতারা আগমন করল! তাদের মধ্যে বিতর্ক হল। রহমতের ফেরেশতারা বলল ঃ এ ব্যক্তি তওবা করে এবং আন্তরিকভাবে আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হয়ে এসেছে। সুতরাং তার রূহ কবয করার অধিকার আমাদের। আযাবের ফেরেশতারা বলল ঃ সে কোন দিন কোন ভাল কাজ করেনি। তাই আমরাই তার রূহের হকদার। ইতিমধ্যে জনৈক ফেরেশতা মানুষের বেশে সেখানে উপস্থিত হল। ফেরেশতাদের উভয় পক্ষ তাকে তাদের ব্যাপারে সালিস করে নিল। সে বলল ঃ এই ব্যক্তির উভয় দিকের দূরত্ব মেপে নেয়া উচিত। যেদিকের দূরত্ব কম হবে, তাকে সেই দিকের গণ্য করতে হবে। দূরত্ব মেপে দেখা গেল, যেদিকে সে যেতে চেয়েছিল, সেদিকের দূরত্ব অর্ধ হাত কম। ফলে, রহমতের ফেরেশতারাই তার রূহ কবয করে নিল। এ থেকে জানা গেল, মুক্তি তখনই পাওয়া যাবে, যখন সৎকর্মের পাল্লা ভারী হবে যদিও তা সামান্যই হয়। এ কারণেই তওবাকারীর জন্যে অধিক পরিমাণে সৎকর্ম করা জরুরী।

ভবিষ্যতকালের জন্যে তওবাকারীর উচিত আল্লাহ তা'আলার সাথে সেই গোনাহ না করার পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করা। উদাহরণতঃ রোগী রুগ্নাবস্থায় জানতে পারল যে, অমুক ফল তার জন্যে ক্ষতিকর। অতঃপর সে

দৃঢ় সংকল্প করল যে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত কখনও সেই ফল খাবে না। তার এই সংকল্প তখন তো পাকাপোক্তই হয়ে থাকে– যদিও অন্য সময় খাহেশ প্রবল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অতএব, তওবা করার সময় তওবাকারী পাকাপোক্ত সংকল্প করবে। নতুবা তাকে তওবাকারী বলা হবে না। তার এই সংকল্প শুরুতে তখন পূর্ণ হবে, যখন সে নির্জনবাস, নীরবতা, স্বল্প আহার, স্বল্প নিদ্রা ও হালাল খাদ্য অবলম্বন করবে। যদি তার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে হালাল উপার্জন বিদ্যমান থাকে অথবা সে জীবন যাপন উপযোগী কোন পেশা করে, তবে এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কেননা, হারাম খাদ্য সকল গোনাহের মূল। হারাম ভক্ষণে অবিচল থাকলে তওবাকারী হবে কিরূপে? যদি তওবাকারী নির্জনবাস অবলম্বন না করে, তবে তওবায় "ইস্তেকামাত" তথা দৃঢ়তা পূর্ণাঙ্গ হবে। কেবল কিছুসংখ্যক গোনাহ যথা মদ, যিনা ও ছিনতাই থেকে তওবা করবে। এটা সর্বাবস্থায় তওবা নয়; বরং কারও কারও মতে এরূপ তওবা জায়েযই নয়। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, কতক গোনাহ পরিত্যাগ করা মোটেই উপকারী নয়। কেননা, আমরা জানি, গোনাহ বেশী হলে আযাব বেশী এবং কম হলে আযাব কম হবে। পক্ষান্তরে একদল উপরোক্ত তওবাকে জায়েয বলে থাকে। এর অর্থ এরূপ যে, কতক গোনাহ থেকে তওবা করেই মুক্তি ও সাফল্য অর্জন করা যায়। কেননা, মুক্তি ও সাফল্য বাহ্যত দু'-তিনটি গোনাহ ত্যাগ করলেই অর্জিত হয় না। তবে আল্লাহ তা'আলার গোপন ক্ষমা-রহস্য আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

কতক গোনাহ থেকে তওবা করার তিনটি সম্ভাব্য প্রকার রয়েছে। প্রথম প্রকার হল শুধু কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা এবং সগীরা গোনাহ থেকে না করা। এটা সম্ভব। কেননা, তওবাকারী জানে, কবীরা গোনাহ আল্লাহর কাছে গুরুতর। এ কারণে তিনি দ্রুত ক্রুদ্ধ হন। পক্ষান্তরে সগীরা গোনাহে ক্ষমা পাওয়ার আশা প্রবল। এই জানার কারণে এটা সম্ভব যে, সে কেবল বড় গোনাহ থেকে তওবা করবে এবং তজ্জন্য অনুতপ্ত হবে। পূর্ববর্তী যুগে অনেক তওবাকারী অতিক্রান্ত হয়েছে; অথচ তাদের মধ্যে কেউ নিষ্পাপ ছিল না। এ থেকে বুঝা যায়, তওবার জন্যে নিষ্পাপ হওয়া জরুরী নয়।

দ্বিতীয় প্রকার হল কতক কবীরা গোনাহ থেকে তওবা করা এবং কতক থেকে না করা। এটাও বাস্তবসম্মত। কেননা, মানুষ বিশ্বাস করে, কবীরা গোনাহসমূহের মধ্যে স্তরভেদ রয়েছে। কিছু কবীরা গোনাহ তীব্র এবং কিছু অপেক্ষাকৃত হাল্‌কা। উদাহরণতঃ কেউ হত্যা, লুণ্ঠন, যুলুম ও অপরের অধিকার হরণ থেকে এই মনে করে তওবা করে যে, এগুলো বান্দার হক, যা কখনও মাফ হবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর হক থেকে তওবা করে না এই বিশ্বাসের কারণে যে, এটা ক্ষমাযোগ্য।

তৃতীয় প্রকার হল, একাধিক সগীরা গোনাহ থেকে তওবা করা। কিন্তু কবীরা গোনাহ থেকে জানা সত্ত্বেও তওবা না করা এবং অবিচল থাকা। যেমন, কেউ মাহরাম নয়— এমন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত অথবা গীবত থেকে তওবা করে, কিন্তু মদ্যপান থেকে তওবা করে না। এটাও সম্ভবপর। কেননা, প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি গোনাহকে ভয় করে এবং স্বীয় কার্যকলাপের জন্যে অনুতপ্ত হয়। কেউ কম, কেউ বেশী। গোনাহে যে পরিমাণে আনন্দ পাওয়া যায়, সেই পরিমাণে ভয় কম হয়। ফলে, অধিক আনন্দদায়ক গোনাহে আনন্দ প্রবল এবং ভয় দুর্বল হয়ে থাকে। পাপাচারী ব্যক্তি কখনও এমন মাদকাসক্ত হয় যে, সবর করতে পারে না; কিন্তু গীবত, পরনিন্দা ও পরনারীর প্রতি তাকানোর খাহেশ তার মধ্যে মোটেই থাকে না। তার মধ্যে খোদাভীতি এমন থাকে, যা দ্বারা দুর্বল আগ্রহের মূলোৎপাটন করতে পারে কিন্তু প্রবল আগ্রহে পারে না। এই ভয়ের কারণে সে এমন কাজকর্ম বর্জন করে, যার প্রতি আগ্রহ কম। সে মনে মনে বলে, যদি শয়তান কতক গোনাহে আমাকে কাবু করে ফেলে, তবে তারই কাবুতে থাকা আমার জন্যে উচিত হবে না; বরং কতক গোনাহে তার সাথে জেহাদ করে আমাকে বিজয়ী হতে হবে। হয়তো এই বিজয় আমার অন্য গোনাহের জন্যে কাফ্‌ফারা হয়ে যাবে। পাপাচারীর মনে এই ধারণা না থাকলে তার নামায পড়া ও রোযা রাখার কারণ বোধগম্য হয় না। যদি তাকে বলা হয় ঃ তুমি যে নামায পড়, তা আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্যে হলে নাজায়েয, আর আল্লাহর জন্যে হলে পাপাচারকে আল্লাহর জন্যে বর্জন কর, তবে সে এর জবাবে একথাই বলবে যে, আল্লাহ আমাকে দুটি আদেশ দিয়েছেন। যদি আমি উভয়টি অমান্য করি, তবে দুটি আযাব ভোগ করতে

হবে। আমি একটি আদেশ পালনের ক্ষেত্রে শয়তানকে পরাভূত করার শক্তি রাখি এবং অপরটি পালনে শয়তানকে পরাস্ত করতে অক্ষম। তাই যে বিষয়ে শক্তি আছে, সে জেহাদ করে আমি শয়তানকে ব্যর্থ করে দেই। আমি আশা করি, আল্লাহ তা'আলা এই জেহাদকে সে গোনাহের কাফফারা করে দেবেন, যাতে আমি অক্ষম। মোটকথা, এটা নিঃসন্দেহে সম্ভবপর; বরং প্রত্যেক মুসলমানের অবস্থা তাই। এমন মুসলমান কে, যার মধ্যে এবাদত ও গোনাহের সহ-অবস্থান নেই? এর কারণ উপরোক্ত বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই নয়।

এখানে প্রশ্ন হয়, যদি কোন ব্যক্তি যিনা করে, এরপর সে পুরুষত্ব হারিয়ে ফেলে এবং তদবস্থায় যিনা থেকে তওবা করে, তবে তার তওবা দুরস্ত হবে কি না? এর জওয়াব এই যে, তওবা দুরস্ত হবে না। কেননা, তওবা এমন অনুতাপকে বলা হয়, যা থেকে এমন কাজ বর্জন করার সংকল্প উৎপন্ন হয়, যা করার ক্ষমতা তওবাকারীর রয়েছে। আর যে কাজ করার ক্ষমতাই নেই, তা তো আপনা-আপনিই অন্তর্হিত হয়ে যায়, বর্জন করার কারণে অন্তর্হিত হয় না। হ্যাঁ, পুরুষত্ব হারানোর পর যদি সে যিনার ক্ষতি সম্পর্কে সম্যক অবগতি লাভ করে এবং তজ্জন্যে তার মধ্যে এমন দুঃখ ও অনুতাপ উথলে উঠে যে, তার মধ্যে পুরুষত্ব থাকলেও তা এই অনুতাপের সামনে পরাভূত হয়ে যেত, তবে এমতাবস্থায় আশা করা যায় যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মাফ করে দেবেন এবং এই অনুতাপ তার কাফফারা হয়ে যাবে। সারকথা এই যে, অন্তর থেকে গোনাহের অন্ধকার দূর হওয়ার জন্যে দুটি বিষয় দরকার— এক, অনুতাপের জ্বালা এবং দুই, গোনাহ বর্জনের জন্যে ভবিষ্যতে কঠোর সাধনা। বর্ণিত ক্ষেত্রে পুরুষত্বহীনতার কারণে সাধনা হতে পারে না। কিন্তু যদি অনুতাপই এমন শক্তিশালী হয় যে, সাধনা ছাড়াই গোনাহের অন্ধকার দূর করে দেয়, তবে এটা অসম্ভব নয়। অন্যথায় বলতে হবে, তওবাকারীর তওবা তখন কবুল হয়, যখন সে তওবার পর কিছুদিন জীবিত থাকে এবং এই দিনগুলোতে কয়েকবার সেই গোনাহের ব্যাপারে নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে নেয়। কিন্তু শরীয়তের কোথাও এরূপ শর্ত বুঝা যায় না।

তওবার ব্যাপারে মানুষের স্তরভেদ ঃ জানা উচিত যে, তওবার ব্যাপারে তওবাকারীদের চারটি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি গোনাহ থেকে তওবা করে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। পূর্বে যে সকল ত্রুটি করেছিল, সেগুলো পূরণ করবে এবং পুনরায় সেই সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি ছাড়া গোনাহ করার কথা কল্পনাও করবে না, যেগুলো থেকে মানুষ নবী না হলে অভ্যাসগত ভাবে মুক্ত হয় না। একেই বলা হয় তওবায় অবিচল থাকা এবং এরই নাম "তাওবাতুন্নাসূহ" (খাঁটি তওবা)। এরূপ মনকেই কোরআন পাকে "নাফসে মুতমায়িন্নাহ" (প্রশান্ত মন) বলা হয়েছে, যে তার পরওয়ারদেগারের সামনে সন্তুষ্টচিত্তে উপস্থিত হবে এবং পরওয়ারদেগারও তার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন। নিম্নোক্ত হাদীসে এরূপ তওবাকারীদের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে—

سَبَقَ الْمُفْرِدُوْنَ الْمُسْتَهْتِرُوْنَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَضَعَ الذِّكْرُ عَنْهُمْ اَوْزَارَهُمْ فَوَرَدُوا الْقِيَامَةَ خِفَافًا

অর্থাৎ, আল্লাহর যিকিরের প্রতি লোভী ব্যক্তিরা অগ্রগামী হয়েছে। যিকির তাদের বোঝা নামিয়ে দিয়েছে। ফলে, তারা কিয়ামতের ময়দানে হালকা-পাতলা হয়ে পৌছেছে।

এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, তাদের উপর বোঝা ছিল; কিন্তু যিকিরের ফলে তাদের বোঝা নেমে গেছে।

দ্বিতীয় স্তর এমন তওবাকারীর, যে মৌলিক এবাদত পালনে এবং সকল কবীরা গোনাহ বর্জনে সুদৃঢ় থাকে। এতদসত্ত্বেও এমন গোনাহ থেকে মুক্ত নয়, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপন কাজকর্মে এরূপ গোনাহ্ করে ফেলে, যা ইচ্ছা ব্যতিরেকেই হয়ে যায়। অর্থাৎ, আপন কাজকর্মে এরূপ গোনাহ্ করে ফেলে, পূর্ব থেকে যায় ইচ্ছা থাকে না। যখন সে এ ধরনের গোনাহ্ করে ফেলে, তখন নিজেকে তিরস্কার করে, লজ্জিত হয় এবং ভবিষ্যতে এরূপ গোনাহের ধারে-কাছে না যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করে। এরূপ মনকে 'নাফসে লাওয়ামা' (তিরস্কারকারী মন) বলা সমীচীন।

কেননা, অনিচ্ছাকৃত কুকর্মের কারণে এই মন নিজেকে ধিক্কার দেয়। যদিও প্রথম স্তরটি সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু এই স্তরও যে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, তাতে দ্বিমতের অবকাশ নেই। অধিকাংশ তওবাকারীর অবস্থা এমনি হয়ে থাকে। কেননা, কুপ্রবৃত্তি মানুষের মজ্জাগত একটি উপাদান। এ থেকে মুক্ত থাকা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মানুষ চেষ্টা করে পাপের তুলনায় পুণ্য বেশী করতে পারে, যাতে তার পুণ্যের পাল্লা ভারী হয়।

এরূপ তওবাকারীর জন্যে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন—

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبَائِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ -

অর্থাৎ, যারা ছোটখাটো বিষয় ছাড়া বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজকর্ম থেকে বেঁচে থাকে, তারা ক্ষমা পাবে। নিশ্চয় তোমার পালনকর্তার ক্ষমা বিস্তৃত।

মানুষ ইচ্ছা ছাড়াই যে সব সগীরা গোনাহ করে ফেলে, সেগুলো "লামাম" তথা ছোটখাটো বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَا فَعَلُوْا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوْا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفَرُوْا لِذُنُوْبِهِمْ -

অর্থাৎ, আর তারা, যারা কোন অশ্লীল কর্ম করলে অথবা নিজেদের প্রতি অন্যায় করলে আল্লাহকে স্মরণ করে, অতঃপর নিজেদের গোনাহের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে।

এখানে নিজেদের প্রতি অন্যায় করা সত্ত্বেও যে তাদের প্রশংসা করা হয়েছে, তা এজন্যেই যে, তারা পরবর্তী সময়ে অনুতাপ করেছে এবং নিজেদের তিরস্কৃত করেছে। এরই অনুরূপ স্তরের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে এই হাদীসে—

خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتَنٍ تَوَّابٍ

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম ব্যক্তি, যে গোনাহে লিপ্ত হলে তওবা করে।

অন্য হাদীসে আছে—

اَلْمُؤْمِنُ كَالسُّنْبُلَةِ يَفِيْئُ اَحْيَانًا وَيَمِيْلُ اَحْيَانًا

অর্থাৎ, মুমিন গমের শীষের মত— কখনও গোনাহ থেকে ফিরে আসে আবার কখনও তৎপ্রতি ঝুঁকে পড়ে।

এক হাদীসে আরও বলা হয়েছে ঃ কখনও কখনও গোনাহ করা ঈমানদারের জন্যে জরুরী। এসব রেওয়ায়েত থেকে নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় যে, এই পরিমাণ অপরাধের কারণে তওবা ভঙ্গ হয় না এবং এরূপ অপরাধ গোনাহে অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত নয়। সুতরাং এরূপ তওবাকারীদেরকে নিরাশ করা ফেকাহ্‌বিদদের উচিত নয়। ফেকাহবিদ তো তাকেই বলা হয়, যে মানুষকে ত্রুটি-বিচ্যুতি ও গোনাহ করার কারণে সৌভাগ্যের স্তরে পৌছার ব্যাপারে হতাশাগ্রস্ত করে না। হাদীসে বর্ণিত আছে—

كُلُّ بَنِيْ اٰدَمَ خَطَّاؤُوْنَ وَخَيْرُ الْخَطَّائِيْنَ التَّوَّابُوْنَ الْمُسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থাৎ, সকল আদম সন্তান গোনাহ্‌গার। তবে উত্তম গোনাহ্‌গার তারা, যারা তওবা করে ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا وَيَدْرَؤُوْنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ -

অর্থাৎ, এসব লোকেরা তাদের পুরস্কার দ্বিগুণ পাবে। কারণ, তারা সবর করে এবং পাপকর্মকে সৎকর্মের দ্বারা প্রতিহত করে।

এখানে বলা হয়েছে যে, তারা পাপের পরে পুণ্য করে। এরূপ বলা হয়নি যে, তারা পাপ মোটেই করে না।

তৃতীয় স্তর হল তাদের, যারা তওবা করে কিছুকাল তাতে অটল থাকে।

এরপর কোন গোনাহের খাহেশ প্রবল হয়ে যায় এবং তা ইচ্ছাকৃতভাবে করে ফেলে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যথারীতি এবাদত পালনে সর্বদা তৎপর থাকে এবং খায়েশ থাকা সত্ত্বেও অন্যান্য গোনাহ বর্জন করে। কেবল এক অথবা দু' গোনাহের ব্যাপারে তারা অক্ষম থাকে এবং এগুলো থেকেও তওবা করার ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করে। কিন্তু আজ-কাল করে তা পিছিয়ে দেয়। এরূপ লোকদের শানে আল্লাহ পাক বলেন ঃ

وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا ۔

অর্থাৎ, কিছু লোক তাদের গোনাহ স্বীকার করে। তারা একটি পুণ্যকাজ করে এবং অপরটি পাপকাজ।

আশা করা যায়, এরূপ লোকদের তওবা আল্লাহ তা'আলা কবুল করবেন। কিন্তু যেহেতু তারা টালবাহানা করে তওবাকে পিছিয়ে দেয়, এ কারণে তাদের পরিণতি বিপজ্জনকও হতে পারে। কে জানে, তওবার আগেই তাদের মৃত্যু এসে যায় কিনা! এরপর আল্লাহর যা ইচ্ছা, তাই প্রকাশ পেতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপায় তাদের ক্ষতিপূরণ করে নেবেন অথবা তাদের দুর্ভাগ্যই প্রবল হয়ে পড়বে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۔

অর্থাৎ, কসম মানুষের এবং যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন। সে সফলকাম হবে, যে নিজেকে পবিত্র করবে এবং সে-ই ব্যর্থ হবে, যে নিজেকে কলুষিত করবে।

সুতরাং বান্দা যখন কোন গোনাহে লিপ্ত হয় এবং গোনাহ থাকে নগদ আর তওবা থাকে বাকীর খাতায়, তখন এটা তার দুর্ভাগ্যের লক্ষণ। এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে— বান্দা সত্তর বছর পর্যন্ত জান্নাতীদের অনুরূপ আমল করে। ফলে, মানুষ তাকে জান্নাতী বলতে শুরু করে এবং তার মধ্যে ও

জান্নাতের মধ্যে মাত্র অর্ধ হাত ব্যবধান থেকে যায়। কিন্তু ভাগ্যলিপি প্রবল হয় এবং সে দোযখীদের মত আমল করতে থাকে এবং অবশেষে দোযখে পতিত হয়।

চতুর্থ স্তর এমন তওবাকারীর, যারা তওবার পর কিছুদিন তাতে অটল থাকে, এরপর এক গোনাহ অথবা অনেক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে এবং অন্তরে তওবা করার ইচ্ছা থাকে না অথবা গোনাহের জন্যে আফসোস করে না। এরূপ ব্যক্তি গোনাহে অবিচলদের অন্তর্ভুক্ত। এরূপ নফসকে বলা হয় "নাফসে আম্মারা বিসসু" (কুকর্মের আদেশদাতা নফস)। তার পরিণাম মন্দ হওয়ার সমূহ আশংকা রয়েছে। খোদা না করুন, পাপকর্মেই তার জীবনের অবসান ঘটলে সে হবে চরম হতভাগা। পক্ষান্তরে অন্তিম অবস্থা ভাল হলে দোযখ থেকে মুক্তির আশা করা যাবে— যদিও তা কিছুকাল শাস্তি ভোগ করার পর হয়।

তওবাকারীর গোনাহ হয়ে গেলে কি করবে?

যদি তওবাকারী কোন গোনাহ করে ফেলে, তবে তার উপর দুটি বিষয় ওয়াজিব। প্রথমত, সে তওবা ও অনুতাপ করবে। দ্বিতীয়ত, এ গোনাহকে মিটিয়ে ফেলার জন্যে তার বিপরীত কোন পুণ্যকাজ করবে। উপরে এর পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। যদি খাহেশের প্রাবল্যের কারণে মন ভবিষ্যতে গোনাহ বর্জন করার সংকল্প না করে, তবে সে যেন প্রথম ওয়াজিবটি পালনে ব্যর্থ হয়। এমতাবস্থায় দ্বিতীয় ওয়াজিবটিও বর্জন করা সমীচীন হবে না। বরং পুণ্যকাজ সম্পন্ন করে পাপমোচন করার উপায় করতে হবে। এতে কমপক্ষে এটা তো হবে যে, সে পাককাজের সাথে পুণ্যকাজেরও সম্পাদনকারী সাব্যস্ত হবে। যে সকল পুণ্যকাজ দ্বারা পাপমোচন হয়ে থাকে, সেগুলো অন্তর অথবা জিহ্বা অথবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়। সুতরাং যা দ্বারা পাপ কাজ করা হয়, পুণ্যকাজও তা দ্বারাই সম্পাদন করতে হবে। উদাহরণতঃ যদি পাপকাজ অন্তর থেকে প্রকাশ পায়, তবে তা মোচন করার জন্যে আল্লাহ তা'আলার দরবারে কান্নাকাটি ও ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে এবং পলাতক গোলামের ন্যায় নিজেকে লাঞ্ছিত করতে হবে, যাতে সকলের কাছে স্বীয় লাঞ্ছনা প্রকাশ হয়ে পড়ে। এছাড়া, অন্তরে এবাদত ও মুসলমানদের শুভেচ্ছার মনোভাব পোষণ করতে হবে।

জিহ্বা দ্বারা গোনাহের কাফ্ফারার উপায় এই যে, স্বীয় অন্যায় ও অপরাধ স্বীকার করবে এবং বলবে—

رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَعَمِلْتُ سُوْءً فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ -

অর্থাৎ, পরওয়ারদেগার, আমি নিজের প্রতি অন্যায় করেছি এবং কুকর্ম করেছি। অতএব আমার পাপকর্মসমূহ মার্জনা কর।

এছাড়া সওয়াব অধ্যায়ে লিখিত সকল প্রকার এস্তেগফার বলতে থাকবে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা কাফ্ফারা আদায় করার পদ্ধতি এই যে, এগুলো দ্বারা সদকাসহ অন্যান্য সকল প্রকার এবাদত পালন করবে। হাদীসে বর্ণিত আছে— মানুষ যখন পাপ কাজের পশ্চাতে আটটি কাজ করে, তখন আশা করা যায়, তার সেই পাপ মাফ হয়ে যাবে। এগুলোর মধ্যে চারটি কাজ অন্তর দ্বারা সম্পাদিত হয়। (১) তওবা করা অথবা তওবার সংকল্প করা, (২) গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা ভাল মনে হওয়া, (৩) গোনাহের শাস্তিকে ভয় করতে থাকা এবং (৪) গোনাহ মার্জিত হওয়ার আশা করা। অবশিষ্ট চারটি কাজ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদিত হয়— (১) গোনাহের পর দু'রাকআত নামায পড়া, (২) এই নামাযের পর সত্তর বার এস্তেগফার এবং একশ' বার "সোবহানাল্লাহিল আযীম ওয়া বিহামদিহী" পাঠ করা, (৩) কিছু দান-খয়রাত করা এবং (৪) একটি রোযা রাখা। কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে। পূর্ণাঙ্গ উযু করে মসজিদে যাবে এবং দু'রাকআত নামায পড়বে। কতক রেওয়ায়েতে চার রাকআতের উল্লেখ আছে। এক হাদীসে বলা হয়েছে— যখন কেউ পাপ কাজ করে, তখন তার উচিত এরূপ পুণ্যকাজ করা, যাতে কাটাকাটি হয়ে যায়। গোপন পাপের বিনিময়ে গোপন পুণ্যকাজ করবে এবং প্রকাশ্য পাপের বদলে প্রকাশ্য পুণ্য কাজ করবে। এ কারণেই বলা হয়েছে যে, গোপনে দান-খয়রাত করলে রাতের গোনাহ মাফ হয় এবং প্রকাশ্য দান-খয়রাত দ্বারা দিনের গোনাহ মিটে যায়। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূলে আকরাম (সাঃ)-এর খেদমতে আরয করল ঃ আমি একজন মহিলার সাথে কিছু করেছি— তবে যিনা করিনি। এখন এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার যা

বিধান, তা আমার উপর প্রয়োগ করুন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি আমার সাথে ফজরের নামায পড়নি? সে বলল ঃ হাঁ পড়েছি। তিনি বললেন ঃ পুণ্য কাজ পাপ কাজকে খেয়ে ফেলে। এ থেকে জানা গেল যে, মহিলাদের সাথে যিনার নিচে যা কিছু করা হয়, তা সগীরা গোনাহ। কারণ, এটা নামায দ্বারা মিটে যায়। কবীরা গোনাহ নামায দ্বারা মিটে না।

মোট কথা, মানুষের উচিত প্রত্যহ আপন ত্রুটিসমূহ একত্রিত করে নফসের কাছ থেকে হিসাব নেয়া এবং এগুলোকে মিটানোর জন্যে পরিশ্রম সহকারে সমপরিমাণ পুণ্য কাজ করা।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি গোনাহ থেকে এস্তেগফার তথা ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং অব্যাহতভাবে গোনাহ করে যায়, সে যেন আল্লাহ তা'আলার সাথে রং-তামাশা করে। সুতরাং অব্যাহত গোনাহ সত্ত্বেও এস্তেগফার কিরূপে উপকারী হবে? জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ আমি আমার মৌখিক এস্তেগফার থেকেও এস্তেগফার করি। কেউ কেউ বলেন ঃ শুধু মুখে এস্তেগফার পড়া মিথ্যুকদের তওবা। হযরত রাবেয়া বলেন ঃ আমাদের এস্তেগফারের জন্যে অনেক এস্তেগফার দরকার। এখন প্রশ্ন হল, এসব রেওয়ায়েতে কোন্ এস্তেগফার বুঝানো হয়েছে? এর জওয়াব এই যে, এস্তেগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। আল্লাহ পাক রসূলে করীম (সাঃ)-এর শারীরিক উপস্থিতির যে প্রভাব বর্ণনা করেছেন, এস্তেগফারের প্রভাবও তাই ব্যক্ত করেছেন। এস্তেগফারের এর চেয়ে বড় মাহাত্ম্য আর কি হবে? এরশাদ হয়েছে—

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ -

অর্থাৎ, আপনার উপস্থিতিতে আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেবেন না এবং আল্লাহ তাদের শাস্তিদাতা নন যে পর্যন্ত তারা এস্তেগফার করে।

এ কারণেই কোন কোন সাহাবী বলতেন ঃ আমাদের জন্যে দুটি আশ্রয় ছিল। তন্মধ্যে একটি আশ্রয় উঠে গেছে; অর্থাৎ জনাব সরওয়ারে কায়েনাত (সাঃ)-এর উপস্থিতি এখন আর আমাদের মধ্যে নেই। আর দ্বিতীয় আশ্রয়

অর্থাৎ, এস্তেগফার এখনও আমাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে। যদি এটাও বিদায় নেয়, তবে আমরা ধ্বংস হয়ে যাব। এখন শুনুন, যে এস্তেগফার মিথ্যুকদের তওবা, তা কেবল মৌখিক এস্তেগফার; অর্থাৎ যার মধ্যে অন্তরের সংযোগ মোটেই নেই। যেমন, মানুষ অভ্যাসগতভাবে অনবধানতার ছলে "আস্তাগফিরুল্লাহ" বলে দেয় অথবা দোযখের বর্ণনা শুনে "নাউযুবিল্লাহ" উচ্চারণ করে, অথচ অন্তরে এর কোন প্রভাব থাকে না। এই এস্তেগফারে কেবল জিহ্বা নড়াচড়া করে। এতে কোন উপকার নেই। হাঁ, যদি এর সাথে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক কাকুতি-মিনতি ও বিনয়ভাব যোগ হয় এবং সত্যিকার ইচ্ছা, খাঁটি নিয়ত ও পূর্ণ আগ্রহ সহকারে মাগফেরাত কামনা করা হয়, তবে এটা নিঃসন্দেহে একটি পুণ্য কাজ। এস্তেগফারের মাহাত্ম্য সম্পর্কিত রেওয়ায়েতসমূহে এই এস্তেগফারই উদ্দেশ্য। বলা হয়েছে—

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَلَوْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এস্তেগফার করে, সে অব্যাহতভাবে গোনাহকারী নয়— যদি দিনে সত্তর বারও গোনাহ করে।

এ হাদীসে এস্তেগফারের অর্থ আন্তরিক এস্তেগফার। তওবা ও এস্তেগফারের অনেকগুলো স্তর রয়েছে। প্রাথমিক স্তরগুলোও উপকার থেকে খালি নয়— যদিও শেষ স্তর পর্যন্ত পৌঁছা নসীব না হয়। এ কারণেই হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ বান্দার সর্বাবস্থায় তার প্রভুর প্রয়োজন। তাই সকল বিষয়ে প্রভুর দিকে রুজু করা তার জন্যে উত্তম। উদাহরণতঃ সে যদি গোনাহে লিপ্ত হয়, তবে এরূপ প্রার্থনা করবে ঃ ইলাহী, আমার রহস্য ফাঁস করো না। গোনাহ সমাপ্ত হওয়ার পর এরূপ দোয়া করবে ঃ প্রভু, আমার তওবা কবুল কর এবং তওবার পর আরয করবে ঃ ইলাহী, আমাকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার প্রভূত শক্তি দান কর। এমনিভাবে বান্দা যখন কোন উত্তম কাজ করবে, তখন অনুনয় করে বলবে, আল্লাহ, আমার এ আমলটি কবুল কর। জনৈক ব্যক্তি হযরত সহলকে জিজ্ঞেস করল ঃ যে এস্তেগফার গোনাহকে বিলীন করে দেয়, সেটি কোনটি? তিনি বললেন ঃ প্রথমে এস্তেজাবত; এরপর এনাবত, এরপর তওবা। এস্তেজাবতের অর্থ হচ্ছে

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমলসমূহ; যেমন দু'রাকআত নামায ও দোয়া। এনাবতের মানে হচ্ছে অন্তরের আমলসমূহ; যেমন সত্যিকার ইচ্ছা, খাঁটি নিয়ত ইত্যাদি। আর তওবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টার প্রতি মনোনিবেশ করা।

তওবাকারী আল্লাহর বন্ধু— এই হাদীস সম্পর্কে হযরত সহলকে প্রশ্ন করলে তিনি বললেন ঃ বন্ধু তখন হয়, যখন এই আয়াতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ তার মধ্যে পাওয়া যায়—

اَلتَّائِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْاٰمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّاهُوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ-

অর্থাৎ, তওবাকারী, এবাদতকারী, শোকরকারী .... ।

তিনি আরও বললেন ঃ বন্ধু তাকে বলা হয়, যে বন্ধুর অপ্রিয় বিষয়সমূহের ধারে-কাছেও যায় না। সারকথা এই যে, তওবার ফলাফল দুটি— এক, গোনাহকে এমনভাবে বিলুপ্ত করা যেন সে গোনাহ করেইনি এবং দুই, বন্ধু হয়ে যাওয়ার জন্যে মর্তবা লাভ করা। অন্তর দ্বারা ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং পুণ্যকাজ দ্বারা ক্ষতিপূরণ করা যদিও প্রাথমিক স্তরে অব্যাহত গোনাহের সমস্যার সমাধান করে না, তথাপি উপকার থেকে খালি নয়। সুতরাং এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এরূপ এস্তেগফার ও পুণ্যকাজ করা-না করা উভয় সমান। বরং অধ্যাত্মবিদগণ নিশ্চিতরূপে জানেন যে, আল্লাহ তা'আলার এই উক্তি যথার্থ—

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ

অর্থাৎ, কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তা দেখতে পাবে।

সৎকর্মের প্রত্যেক অণুতে কিছু না কিছু প্রভাব অবশ্যই থাকে, যেমন নিক্তির একদিকে একটি চাউল রেখে দিলে কিছু না কিছু ঝুঁকে পড়বে। একটি চাউলের কোন প্রভাব না থাকলে দ্বিতীয় চাউল রেখে দিলেও কোন

প্রভাব না হওয়া উচিত। এ থেকে জরুরী হয়ে পড়ে যে, বেশী পরিমাণ চাউল রাখলেও পাল্লা ঝুঁকবে না। অথচ এটা বাস্তবের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। অণু পরিমাণ সৎকর্মের অবস্থাও তদ্রূপ। এর দ্বারাও আমলের দাঁড়িপাল্লা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। অতএব, সামান্য পরিমাণ সৎকর্ম ও অণু পরিমাণ এবাদতকে হেয় মনে করে বর্জন করা উচিত নয় এবং কোন সামান্য গোনাহকে সামান্য মনে করে তা করে ফেলা সমীচীন নয়। কেননা, বলা হয়, "কণা কণা বালুকায় সাহারা সৃজন।" আমাদের মতে মুখে এস্তেগফার বলাও পুণ্যের অন্তর্ভুক্ত। কেননা, কোন মুসলমানের গীবত অথবা অনর্থক কথা বলার জন্যে জিহ্বাকে নাড়াচাড়া করার তুলনায় সে সময় অনবধানতার সাথে এস্তেগফার উচ্চারণ করা নিঃসন্দেহে উত্তম। আর চুপ থাকার তুলনায়ও উত্তম।

জনৈক মুরীদ তার মুরশিদ আবু উসমান মাগরেবীর খেদমতে আরয করল ঃ আমার জিহ্বা মাঝে মাঝে যিকির ও কোরআন পাঠ করতে শুরু করে; অথচ আমার অন্তর গাফেল থাকে। মুরশিদ বললেন ঃ আল্লাহর শোকর কর। তিনি তোমার একটি অঙ্গকে পুণ্য কাজে নিয়োজিত করে দেন— কুকর্ম ও অনর্থক কাজে অভ্যস্ত করেন না। নিঃসন্দেহে এই বুযুর্গের উক্তি সত্য। কেননা, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি স্বাভাবিক বিষয়াদির মত পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হয়ে যায়, তবে এটা অনেক গোনাহ থেকে আত্মরক্ষার কারণ হয়ে যায়। উদাহরণতঃ এস্তেগফারে অভ্যস্ত ব্যক্তি যখন কারও মুখে মিথ্যা কথা শুনবে, তৎক্ষণাৎ বলে উঠবে— 'আস্তাগফিরুল্লাহ।" আর অনর্থক কথায় অভ্যস্ত ব্যক্তি মিথ্যা শুনে মন্তব্য করবে— তুমি বড় মিথ্যাবাদী। অথবা এক ব্যক্তি "নাউযুবিল্লাহ" বলায় অভ্যস্ত। সে কোন দুষ্টের দুষ্টামি শুনে অভ্যাসবশত বলে উঠবে— "নাউযুবিল্লাহ"। যদি সে অনর্থক ভাষণে অভ্যস্ত হত, তবে বলত— তোমার প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত। এখানে একটি কথা বলার কারণে সে গোনাহগার হবে এবং অপর কথাটি বলার কারণে গোনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। বেঁচে থাকা জিহ্বার পুণ্যকাজে অভ্যস্ত হওয়ারই প্রভাব।

"আমাদের এস্তেগফারের জন্য অনেক এস্তেগফার দরকার"— হযরত

রাবেয়ার এ উক্তির উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের এস্তেগফারে অন্তর গাফেল থাকে এবং শুধু জিহ্বা নড়াচড়া করে। অন্তরের এই গাফলতির কারণে এ ধরনের এস্তেগফার দরকার। জিহ্বার নড়াচড়ার নিন্দা করা এ উক্তির উদ্দেশ্য নয়; বরং আন্তরিক গাফলতিকে তিরস্কার করা লক্ষ্য। এর কারণেই এস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়।

মোটকথা, কণা পরিমাণ পুণ্যকাজ এবং সামান্যতম গোনাহকেও হেয় ও তুচ্ছ মনে করা উচিত নয়। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ) এরশাদ করেন— আল্লাহ তা'আলা তিনটি বিষয়কে তিনটি বিষয়ের ভিতর লুক্কায়িত রেখেছেন। (১) তিনি নিজের সন্তুষ্টিকে এবাদতের ভেতর গোপন রেখেছেন। সুতরাং কোন এবাদতকে তুচ্ছ মনে করো না। তুমি যাকে তুচ্ছ মনে করবে, হয়তো তার মধ্যে আল্লাহর সন্তুষ্টি লুক্কায়িত রয়েছে। (২) তিনি আপন গযবকে গোনাহের ভেতরে গোপন রেখেছেন। সুতরাং কোন গোনাহকে ক্ষুদ্র মনে করো না। হয়তো এর মধ্যেই আল্লাহর গযব লুক্কায়িত রয়েছে। (৩) তিনি আপন বন্ধুত্বকে বান্দাদের ভেতরে গোপন রখেছেন। অতএব, কোন বান্দাকে অবজ্ঞা করো না। হয়তো আল্লাহর বন্ধু সে-ই।

হযরত জাফর সাদেক অতঃপর আরও বলেন ঃ "এজাবত" তথা সাড়াদানকেও আল্লাহ তা'আলা দোয়ার ভেতরে গুপ্ত রেখেছেন। সুতরাং কোন দোয়া বর্জন করো না। হয়তো সাড়াদান তার মধ্যেই লুক্কায়িত রয়েছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ দুই প্রকার। (১) এমন মানুষ, যাদের মন্দ কাজ-কর্মের প্রতি প্রবণতা নেই এবং যারা অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকা এবং পুণ্যের উপরই লালিত-পালিত হয়। এরূপ মানুষ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে—

يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ شَابٍّ لَيْسَ لَهُ صَبْوَةٌ اِلَى الْجَهْلِ وَاللَّهْوِ

অর্থাৎ, তোমার পরওয়ারদেগার এমন যুবককে পছন্দ করেন, যার মূর্খতা ও হাস্য-কৌতুকের প্রবণতা নেই।

কিন্তু এ ধরনের মানুষ বিরল ও দুষ্প্রাপ্য। (২) দ্বিতীয় প্রকার এমন মানুষ, যারা গোনাহ থেকে বেঁচে থাকে না। এদের এক প্রকার অব্যাহতভাবে গোনাহকারী এবং দ্বিতীয় প্রকার তওবাকারী। এখানে আমাদের উদ্দেশ্য অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার ও চিকিৎসার বর্ণনা করা।

বলা বাহুল্য, চিকিৎসা ছাড়া আরোগ্যলাভ সম্ভব হয় না। যেহেতু রোগের কারণসমূহের বিপরীত কাজ করার নাম চিকিৎসা, তাই যে ব্যক্তি রোগের কারণ সম্পর্কে জ্ঞাত হবে না, সে চিকিৎসার ব্যাপারেও অজ্ঞাত থাকবে। কারণজনিত রোগের চিকিৎসা হচ্ছে সেই কারণকে নির্মূল ও নিষ্ক্রিয় করে দেয়া। প্রত্যেক বস্তু তার বিপরীত বস্তু দ্বারা নিষ্ক্রিয় হয়। এখন অব্যাহত গোনাহের প্রতি লক্ষ্য করলে জানা যাবে. এর কারণ হচ্ছে গাফলতি তথা অনবধানতা ও খাহেশ। তন্মধ্যে গাফলতি সকল অনিষ্টের মূল। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

اُولٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُوْنَ لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ

অর্থাৎ, এরাই গাফেল। বস্তুত আখেরাতে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

অতএব গাফলতি ও খাহেশের বিপরীত বিষয় দ্বারাই অব্যাহত গোনাহের প্রতিকার করতে হবে। গাফলতির বিপরীত বিষয় হচ্ছে সচেতনতা এবং খাহেশের বিপরীত বিষয় খাহেশ-উদ্দীপক বিষয়াদি বর্জনে সবর করা। সুতরাং অব্যাহত গোনাহের চিকিৎসা এমন ঔষধ দ্বারা করতে হবে, যার মধ্যে সচেতনতার মিষ্টতা ও সবরের তিক্ততা উভয়টি বিদ্যমান। জানা উচিত যে, সকল জ্ঞান ও সচেতনতাই আন্তরিক রোগের চিকিৎসা। কিন্তু প্রত্যেক রোগের জন্যে এক বিশেষ জ্ঞান নির্দিষ্ট রয়েছে। আমরা এখানে অব্যাহত গোনাহের সেই বিশেষ জ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করব, যা এ রোগে ফলপ্রদ। তবে সহজে বুঝার জন্যে দৈহিক রোগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব।

প্রথমেই জানা দরকার যে, রোগীকে কয়েকটি বিষয়ে বিশ্বাসী হতে হয়। প্রথমত, মানতে হবে যে, রোগ ও সুস্থতা উভয়টির জন্যে কিছু কিছু কারণ রয়েছে, যা আল্লাহ পাক আমাদের এখতিয়ারে রেখে দিয়েছেন। এতে মূল চিকিৎসার প্রতি বিশ্বাস জন্মে। যার এই বিশ্বাস নেই, সে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসাও করায় না এবং মৃত্যুর উপযুক্ত হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অব্যাহত গোনাহ রোগে প্রথমে মূল শরীয়তের প্রতি ঈমান থাকা চাই। অর্থাৎ, বিশ্বাস থাকতে হবে যে, পারলৌকিক সৌভাগ্যেরও একটি কারণ আছে, যাকে এবাদত বলা হয় আর পারলৌকিক দুর্ভাগ্যেরও একটি কারণ আছে, যাকে পাপ বলা হয়।

দ্বিতীয়ত, কোন বিশেষ চিকিৎসকের প্রতি রোগীর এরূপ আস্থা থাকা দরকার যে, সে চিকিৎসা শাস্ত্রে পারদর্শী ও বিচক্ষণ। তার দেয়া ঔষধ সঠিক কাজ করে। সে কখনও ভুল চিকিৎসা করে না। এমনিভাবে যারা অব্যাহত গোনাহে লিপ্ত, তাদের ঈমান থাকতে হবে যে, রসূলে করীম (সাঃ) সত্যবাদী। তিনি যা বলেছেন, বাস্তবে তাই হবে। চুল পরিমাণ ব্যতিক্রম হবে না।

তৃতীয়ত, রোগীর উচিত চিকিৎসক যেসব ফল খেতে নিষেধ করে, সেগুলো না খাওয়া এবং যেসব ক্ষতিকর বিষয় থেকে বিরত থাকতে বলে, সেগুলো থেকে বিরত থাকা, যাতে পরহেয না করার ভয় অন্তরে প্রতিষ্ঠিত

হয়ে যায়। এমনিভাবে অব্যাহত গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদের সে সমস্ত আয়াত ও হাদীস শ্রবণ ও মান্য করা উচিত, যেগুলোতে "তাকওয়া" তথা পরহেযগারীর প্রতি উৎসাহ প্রদান এবং গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাপারে হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে। এতে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হবে এবং সবর শক্তিশালী হবে, যা এই চিকিৎসার পরবর্তী স্তম্ভ।

চতুর্থত, রোগীর উচিত চিকিৎসক তার বিশেষ রোগের জন্য যা বলে দেয় এবং যে সকল বস্তু নিষিদ্ধ করে দেয়, সেগুলোর প্রতি খুব মনোযোগী হওয়া। অর্থাৎ, প্রথমে সে নিজের অবস্থা, ক্রিয়াকর্ম ও পানাহারের বিবরণ চিকিৎসকের কাছ থেকে জেনে নেবে যে, কোন্ বস্তু তার বিশেষ রোগের জন্য ক্ষতিকর। কেননা, প্রত্যেক রোগীর প্রত্যেক বস্তু পরিত্যাগ করা জরুরী নয়। বরং প্রত্যেক বিশেষ রোগের জন্যে বিশেষ চিকিৎসা রয়েছে। এমনিভাবে প্রত্যেক মানুষ সকল খাহেশ ও সকল গোনাহে লিপ্ত হয় না। প্রত্যেক মোমেন ব্যক্তি বিশেষ এক গোনাহ্ অথবা বিশেষ কিছু গোনাহে লিপ্ত থাকে। তার প্রথমে জানতে হবে এর দ্বারা ধর্মের কতটুকু ক্ষতি হয়। এরপর জানা দরকার এ থেকে সবর কিভাবে করা যায় এবং যে গোনাহ হয়েছে, তা কিভাবে মিটানো যায়!

বলা বাহুল্য, এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান বিশেষভাবে আলেমদের কাছ থেকেই লাভ করা যায়, যারা পয়গম্বরগণের ওয়ারিস। সুতরাং গোনাহগার ব্যক্তি যখন নিজের গোনাহ জেনে নেয়, তখন তার এই রোগের চিকিৎসা কোন চিকিৎসক অর্থাৎ আলেমে দ্বীন দ্বারা শুরু করা উচিত। রোগী যদি নিজের রোগ জানতে না পারে, তবে আলেমের উচিত তাকে তার রোগের কথা বলে দেয়া। এর উপায় এই যে, প্রত্যেক আলেম এক একটি মহল্লা অথবা গ্রামের দায়িত্ব নেবে এবং সেখানকার অধিবাসীদেরকে ধর্ম বিষয়ে শিক্ষাদান করবে। তাদের জন্যে যেসব বিষয় উপকারী এবং যেসব বিষয় ক্ষতিকর, তা পৃথক পৃথক ভাবে বলে দেবে। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের কারণসমূহ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করবে। সে এই অপেক্ষায় থাকবে না যে, কেউ এসে নিজের রোগের কথা তাকে বলবে; বরং স্বয়ং মানুষকে ডেকে এনে উপদেশ দেবে। কেননা, আলেম সমাজ পয়গম্বরগণের সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। পয়গম্বরগণ মানুষকে মূর্খতার উপর ছেড়ে দেননি; বরং

তাদেরকে সমাবেশে একত্রিত করেছেন এবং স্পষ্ট ভাষায় উপদেশ দিয়েছেন। শুরুতে তাদের ঘরে ঘরে উপস্থিত হয়েছেন এবং এক একজনকে তালাশ করে হেদায়াত করেছেন। কেননা, যারা অন্তরের রোগী, তারা তাদের রোগের অবস্থা জানে না। যেমন, কারও মুখমন্ডলে যদি ধবলকুষ্ঠের দাগ থাকে এবং তার কাছে আয়না না থাকে, তবে সে তার রোগের অবস্থা জানতে পারবে না যে পর্যন্ত অন্য কেউ তাকে বলে না দেয়। এটা সকল আলেমের উপর ফরযে আইন। শাসকবর্গের কর্তব্য প্রত্যেক গ্রামে ও মহল্লায় একজন করে দ্বীনদার ফেকাহবিদ আলেম নিযুক্ত করা। যদি কোন ব্যক্তি আলেমের বর্ণিত চিকিৎসা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে, তবে তাকে শাসকদের হাতে সোপর্দ করা উচিত, যাতে তারা তার অনিষ্ট থেকে জনগণকে রক্ষা করে। যেমন কেউ বদ্ধ পাগল হয়ে গেলে তাকে পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেয়া হয়, যাতে তার উৎপাত থেকে জনসাধারণ রক্ষা পায়।

আন্তরিক রোগ দৈহিক রোগের তুলনায় অনেক বেশী। এর কারণ তিনটি। প্রথমত, অন্তরের রোগী জানে না যে, সে রোগী। দ্বিতীয়ত, এ রোগের পরিণতি দুনিয়াতে প্রত্যক্ষ হয় না। দৈহিক রোগের পরিণতি মৃত্যু তো সকলেই প্রত্যক্ষ করে। গোনাহের পরিণতি অন্তরের মৃত্যু, যা দুনিয়াতে জানা যায় না। তাই গোনাহের প্রতি ঘৃণা কম হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, এ রোগের চিকিৎসক দুর্লভ। কারণ, এ রোগের চিকিৎসক হচ্ছে আলেম সম্প্রদায়। বর্তমান যুগে তারা নিজেরাই কঠিন রোগে আক্রান্ত। যেহেতু প্রায় সকলেই রোগাক্রান্ত, তাই তাদের রোগের ক্ষতি ও কুফল প্রকাশমান নয়। তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করে এবং এমন কথা বলে, যা দ্বারা তাদের রোগ আরও বেড়ে যায়। বলা বাহুল্য, সর্বনাশা রোগ হচ্ছে দুনিয়ার মোহ। আর এ রোগটিই চিকিৎসক তথা আলেমদের ভেতরে প্রবল। তারা মানুষকে দুনিয়ার মোহ থেকে সতর্ক করে না এই ভয়ে যে, কেউ যদি বলে দেয় অপরকে উপদেশ না দিয়ে নিজে আত্মরক্ষা করুন! এ কারণেই রোগটি ব্যাপকাকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষ ধ্বংসের পথে অগ্রসর হচ্ছে। না আছে ঔষধ, না আছে চিকিৎসকের নাম-নিশানা। তারা যখন ওয়ায করে, তখন বেশীর ভাগ উদ্দেশ্য এটাই থাকে যে, কোনরূপে মানুষ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হোক। এটা মানুষকে মাগফেরাতের আশায় আশান্বিত করা ছাড়া

হতে পারে না। তাই ওয়াযের মধ্যে আশার কারণসমূহ ও রহমতের প্রমাণসমূহ অধিক বর্ণনা করা হয়। এরূপ ওয়ায শুনে যখন মানুষ ঘরে ফিরে, তখন গোনাহের সাহস আরও বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর অনুকম্পার উপর ভরসা বেড়ে যায়। যদিও আশা ও ভয় উভয়টিই প্রতিকার; কিন্তু দু'ব্যক্তির জন্যে, যারা পৃথক পৃথক রোগে আক্রান্ত। যে ব্যক্তির মধ্যে ভয় এত প্রবল যে, সংসারধর্ম বিসর্জন দিতে চায় এবং যে কাজ করতে অক্ষম, তার সাথে নিজেকে জড়িত করে ফেলে, এরূপ ব্যক্তির অধিক ভয়কে আশার কারণসমূহ বর্ণনা করে হ্রাস করা উচিত, যাতে তার ভয় ভারসাম্যের পর্যায়ে চলে আসে। কিন্তু যে ব্যক্তি গোনাহে নিমজ্জিত থাকা সত্ত্বেও আল্লাহর কৃপার উপর গর্বিত, তার চিকিৎসা ভয়ের কারণসমূহ বর্ণনা করা ছাড়া অন্য কিছু নয়। মোটকথা, চিকিৎসকদের নষ্টামির কারণে রোগ দুরারোগ্য হয়ে গেছে।

এখন আমরা ওয়াযের উপকারী পদ্ধতি বর্ণনা করব। যদিও এটা নাতিদীর্ঘ, কিন্তু আমরা কয়েক প্রকার বিষয়বস্তু উল্লেখ করব, যাতে মানুষ অব্যাহত গোনাহ বর্জন করতে সক্ষম হবে। ওয়াযে চার প্রকার বিষয়বস্তু বর্ণনা করা জরুরী। প্রথমত, কোরআন মজীদে গোনাহগারদের ভীতি প্রদর্শনের জন্যে যে সকল আয়াত বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা করবে। এমনিভাবে এই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস ও রেওয়ায়েতসমূহ উল্লেখ করবে। উদাহরণতঃ রসূলে আকরাম (সাঃ) বলেছেন— প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় দু'জন ফেরেশতা একে অপরের কথার জওয়াব দেয়। এক ফেরেশতা বলে ঃ মানবকুল সৃজিত না হলেই ভাল হত! অন্য ফেরেশতা বলে ঃ চমৎকার হত যদি মানবকুল তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানতে পারত! প্রথম ফেরেশতা বলে ঃ তারা যখন সৃষ্টির উদ্দেশ্য জানল না, তখন যদি নিজেদের জ্ঞান দ্বারাই আমল করে নিত! এক রেওয়ায়েতে আছে, ভাল হত যদি তারা পরস্পর বসে জানা বিষয়গুলোর চর্চা করত! অন্য ফেরেশতা বলে ঃ তারা যদি আপন কুকর্ম থেকে তওবা করে নিত!

জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ বান্দা যখন গোনাহ করে, তখন ডানদিকের ফেরেশতা বামদিকের ফেরেশতাকে বলে ঃ ছয় ঘন্টা পর্যন্ত এই গোনাহটি লিপিবদ্ধ করো না। যদি এ সময়ের মধ্যে সে তওবা ও এস্তেগফার করে

নেয়, তবে লিপিবদ্ধ করা হয় না। নতুবা আমলনামায় লিখে নেয়া হয়। কেউ কেউ বলেন ঃ গোনাহ করার সময় বান্দা যে জায়গায় থাকে, সেই জায়গার মাটি আল্লাহর দরবারে আরয করে— আদেশ হলে আমি তাকে গিলে ফেলি। তার মাথার উপরের আকাশ আল্লাহর কাছে বলে- আদেশ হলে আমি তার উপর ভেঙ্গে পড়ি! কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তাদের উভয়কে বলেন, আমার বান্দা থেকে বিরত থাক। তোমরা তাকে সৃষ্টি করনি। তোমরা সৃষ্টি করলে তার প্রতি তোমাদের দয়া হত। হয়তো সে তওবা করবে এবং আমি ক্ষমা করে দেব, অথবা এই গোনাহের বিনিময়ে কোন সৎকর্ম করবে এবং আমি এ গোনাহকেও পুণ্যে পরিবর্তিত করে দেব। নিম্নোক্ত আয়াতে এটাই বুঝানো হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ اَنْ تَزُوْلَا وَلَئِنْ زَالَتَا اَنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِّنْ بَعْدِهٖ ـ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ধারণ করে রাখেন আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে যাতে টলে না যায়। যদি এগুলো টলে যায়, তবে তিনি ব্যতীত কেউ এগুলোকে ধারণ করতে সক্ষম নয়।

হযরত উমর (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— মোহরকারী ফেরেশতা আরশের সন্নিকটে অপেক্ষমাণ রয়েছে। যখন কোন বড় ধরনের দুষ্কর্ম সংঘটিত হয় এবং হারাম বস্তুসমূহকে হালাল মনে করা হয়, তখন আল্লাহ তা'আলা সেই ফেরেশতাকে পাঠিয়ে দেন। সে মানুষের অন্তরে মোহর লাগিয়ে যায়। ফলে, অন্তরের অভ্যন্তরস্থ বিষয়সমূহ সেখানেই থেকে যায়— প্রকাশের পথ পায় না। হযরত মুজাহিদ বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে— অন্তর হাতের খোলা তালুর মত। যখন মানুষ গোনাহ করে, তখন একটি আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে একে একে সবগুলো আঙ্গুল বন্ধ হয়ে যায়। এটা অন্তরের তালা। গোনাহের নিন্দা ও তওবাকারীদের প্রশংসায় এমনি ধরনের রেওয়ায়েত বহুল পরিমাণে বর্ণনা করা উচিত।

দ্বিতীয় বর্ণনাযোগ্য বিষয় হচ্ছে পয়গম্বর ও পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কাহিনী যে, ভুলভ্রান্তির কারণেই তাদের উপর কেমন বিপদাপদ এসেছে! এ ধরনের কাহিনী অন্তরে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে এবং উপকার অনুভূত হয়।

উদাহরণতঃ হযরত আদম (আঃ) ভুলের কারণে কতই না কষ্ট ভোগ করেছেন! জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। বর্ণিত আছে, তিনি যখন নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণ করলেন, তখন দেহ থেকে জান্নাতী পোশাক উড়ে গেল এবং তিনি উলঙ্গ হয়ে পড়লেন। অতঃপর আরশের উপর থেকে আওয়াজ এল ঃ তোমরা উভয়ে আমার কাছ থেকে নেমে যাও। যে আমার অবাধ্য, তার ঠিকানা আমার কাছে হতে পারে না। হযরত আদম (আঃ) কেঁদে বিবি হাওয়াকে বললেন ঃ একটি মাত্র ভ্রান্তির প্রথম পরিণতিতে আমরা প্রেমাস্পদের কাছ থেকে বিতাড়িত হলাম। বর্ণিত আছে, সোলায়মান ইবনে দাউদ (আঃ)-ও আল্লাহর ক্রোধের শিকার হয়েছিলেন। এর কারণ ছিল সেই চিত্র, যার পূজা তাঁর গৃহে চল্লিশ দিন পর্যন্ত করা হয়েছিল। কেউ কেউ বলেন ঃ তার একটি ছিল এই যে, জনৈকা মহিলা তার পিতার অনুকূলে মোকদ্দমায় রায় দেয়ার জন্যে তাঁকে বলেছিল এবং তিনি তাই করবেন বলে ওয়াদা করেছিলেন। কিন্তু পরে সেরূপ করেননি। কারও মতে অপরাধ ছিল এই যে, সেই মহিলার খাতিরে তার পিতাকে মামলায় জিতিয়ে দেয়ার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছিল।

মোটকথা, এরূপ একটি ভ্রান্তির বিনিময়ে চল্লিশ দিনের জন্যে তাঁর রাজত্ব ছিনিয়ে নেয়া হয় এবং তিনি দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। খাওয়ার জন্যে হাত প্রসারিত করলে খাদ্যবস্তু উধাও হয়ে যেত। তিনি মানুষকে বলতেন ঃ আমাকে খাবার দাও। আমি সোলায়মান ইবনে দাউদ। জওয়াবে মানুষ তাকে প্রহার করে তাড়িয়ে দিত। রেওয়ায়েতে আছে, এক বৃদ্ধার কাছে খাদ্য চাইলে সে তাকে শাসিয়ে দিল এবং মুখে থুথু নিক্ষেপ করল। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে,এক বৃদ্ধা নোংরা পানির একটি পাত্র তাঁর মাথায় ঢেলে দিল। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আংটি মাছের পেট থেকে বেরিয়ে এল এবং চল্লিশ দিন পর তিনি আংটি পরিধান করলেন। তখন পক্ষীকুল পুনরায় তাঁর মাথার উপর ছায়া করে দাঁড়িয়ে গেল এবং জিন, শয়তান বন্য জন্তুরা কাছে এসে গেল। তাদের কেউ কেউ পূর্ববর্তী ধৃষ্টতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হলে তিনি বললেন ঃ অতীত কৃতকর্মের জন্যে তোমাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। এটা ছিল একটি অবশ্যম্ভাবী ঐশী বিষয়।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা ওহীর মাধ্যমে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ বলতে পার, আমি তোমার কলিজার টুকরা ইউসুফকে তোমার কাছ থেকে কেন বিচ্ছিন্ন করেছি? তিনি আরয করলেন ঃ জানি না। এরশাদ হল ঃ কারণ, তুমি তার ভাইদেরকে বলেছিলে-

أَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ

অর্থাৎ, আমার ভয় হয় বাঘ তাকে খেয়ে ফেলবে অথচ তোমরা থাকবে অসতর্ক।

তুমি বাঘের ভয় করেছ, আমার আশা করনি। তুমি ভাইদের গাফলতির কথা চিন্তা করেছ, আমার হেফাযতের প্রতি লক্ষ্য করনি। আল্লাহ পাক আবার প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি জান, আমি ইউসুফকে কেন ফেরত দিয়েছি? তিনি আরয করলেন ঃ না, জানি না। এরশাদ হল ঃ তুমি বলেছিলে—

عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا

অর্থাৎ, হয়তো আল্লাহ তাদের সকলকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন।

তুমি আরও বলেছিলে—

اذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَيْأَسُوا مِن رَّوْحِ اللَّهِ

অর্থাৎ, যাও এবং ইউসুফ ও তার ভাইকে খোঁজ কর। তোমরা আল্লাহর কৃপা থেকে নিরাশ হয়ো না।

এতে করে তুমি আমার আশা করেছিলে। তাই আমি তোমাদের মিলন ঘটিয়েছি। অনুরূপভাবে হযরত ইউসুফ (আঃ) জেলখানায় শাহী মুসাহিবকে বলেছিলেন ঃ তোমার প্রভুকে আমার আটকে থাকার কথাটি স্মরণ করিয়ে দিয়ো। তিনি হয়তো আমাকে মুক্তি দেবেন। আল্লাহ তা'আলা এ ঘটনাটি এভাবে উল্লেখ করেছেন—

فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

অর্থাৎ, অতঃপর শয়তান তাকে প্রভুর কাছে উল্লেখ করার বিষয়টি বিস্মৃত করে দিল। ফলে, ইউসুফকে আরও কয়েক বছর জেলে থাকতে হল।

কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত এ ধরনের অসংখ্য গল্প কেবল কিসসা-কাহিনীর জন্যে নয়; বরং এগুলোতে সচেতন ও চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের জন্যে মূল্যবান শিক্ষা রয়েছে। তারা এগুলো দেখে অনুধাবন করতে পারবে যে, পয়গম্বরগণের ছোট ছোট পদস্খলন যখন মার্জিত হয়নি, তখন অন্যদের কবীরা গোনাহ কিরূপে মাফ হবে? তবে পয়গম্বরগণের সাজা দুনিয়াতে হয়ে গেছে— আখেরাতে কোন পাকড়াও হবে না। এটা তাঁদের বৈশিষ্ট্য। যারা হতভাগ্য, দুনিয়াতে তাদেরকে অবকাশ দেয়া হয়, যাতে পুরামাত্রায় গোনাহ করে নেয়। দুনিয়ার শাস্তি হাল্কা এবং আখেরাতের শাস্তি কঠোরতর। হতভাগাদের কুকর্ম এমনি কঠোর আযাবের যোগ্য। এ কারণেও তাদেরকে দুনিয়াতে অবকাশ দেয়া হয়।

এ ধরনের কথাবার্তা অব্যাহত গোনাহকারীদের সামনে অধিক পরিমাণে বলা উচিত। তওবায় উদ্বুদ্ধ করার জন্যে এটা প্রায়শ উপকারী হয়ে থাকে।

তৃতীয় প্রকার বিষয়বস্তু একথা বর্ণনা করা যে, দুনিয়াতে বান্দা যে সকল বিপদাপদে পতিত হয়, সেগুলো গোনাহের কারণে হয়ে থাকে। মানুষ প্রায়ই আখেরাতের ব্যাপারে অলসতা করে; কিন্তু মূর্খতাবশত পার্থিব শাস্তিকে অধিক ভয় করে। অতএব, এ ধরনের মানুষকে এ ধরনের বিষয়বস্তুর দ্বারা হেদায়াতের পথে আনা জরুরী। কেননা, অধিকাংশ সময় গোনাহের অমঙ্গল দুনিয়াতেই মানুষের উপর আপতিত হয়; যেমন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর কাহিনীতে ব্যক্ত হয়েছে। এমনকি, মাঝে মাঝে গোনাহের দরুন মানুষের রুযী-রোযগার সংকীর্ণ হয়ে যায়। কখনও মানুষের মনে সম্মান ও প্রতিপত্তি হ্রাস পায়। ফলে শত্রু প্রবল হয়ে যায়। হাদীসে আছে, গোনাহ করার কারণে বান্দা রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।

হযরত ইবনে মসউদ (রাঃ) বলেন ঃ আমার জানা মতে গোনাহের কারণে মানুষ বিদ্যাশিক্ষা ভুলে যায়। এক হাদীসে এ বিষয়টি এভাবে ব্যক্ত হয়েছে—যে ব্যক্তি গোনাহ করে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তার কাছ থেকে বিছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনও ফিরে আসে না। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ মুখমণ্ডল বিশ্রী হওয়া এবং ধনসম্পদ হ্রাস পাওয়ার নাম লা'নত তথা অভিসম্পাত নয়; বরং অভিসম্পাত হল এক গোনাহ থেকে বের হয়ে তারই অনুরূপ অথবা তদপেক্ষা বড় গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়া। বাস্তবে তিনি ঠিকই বলেছেন। কারণ, লা'নতের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে বঞ্চিত করা এবং রহমত থেকে দূরে ঠেলে দেয়া। মানুষ যখন সৎকাজের তাওফীক পায় না, তখন রহমত থেকে দূরেই সরে পড়ে। এছাড়া প্রত্যেক গোনাহ অন্য গোনাহের দিকে আহ্বান করে এবং বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে মানুষ তার আত্মিক খাদ্যরূপী রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। অর্থাৎ, আলেমদের কাছে বসা এবং সৎকর্মীদের সাথে চলাফেরা করা। আল্লাহ তা'আলা এরূপ ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন, যাতে সৎকর্মীগণও তার প্রতি নারাজ থাকে।

জনৈক অধ্যাত্মবিদের ঘটনায় বর্ণিত আছে যে, তিনি পরনের কাপড় উপরে তুলে কর্দমাক্ত পথে চলে যাচ্ছিলেন এবং পদযুগল শক্ত করে মাটিতে রাখছিলেন, যাতে পিছলে না যান। কিন্তু তার পা পিছলে গেল এবং তিনি কাদায় পড়ে গেলেন। এরপর তিনি উঠে কাদার মধ্যেই কেঁদে কেঁদে অগ্রসর হচ্ছিলেন এবং বলছিলেন ঃ বান্দার অবস্থা হুবহু তাই। সে সর্বদা গোনাহ থেকে বেঁচে চলে। অবশেষে একাধিক গোনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এরপর গোনাহের মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এ উক্তি থেকে বুঝা যায়, এক গোনাহ থেকে অন্য গোনাহে লিপ্ত হওয়াও গোনাহের অন্যতম শাস্তি।

মোটকথা, আল্লাহওয়ালাদের মতে দুনিয়ার বিপদাপদ গোনাহের শাস্তির অন্তর্ভুক্ত। সেমতে হযরত ফুযায়ল (রহঃ) বলেন ঃ মানুষ যখন দুনিয়ার দুর্বিপাকে পড়ে, তখন তার জানা উচিত যে, এটা তার গোনাহেরই কারণে। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ যদি আমার গাধার অভ্যাসও বিগড়ে যায়, তবে আমি এটাই মনে করব যে, এটা আমারই ত্রুটি-বিচ্যুতির ফল। জনৈক আল্লাহ-ওয়ালা বলেন ঃ আমি আমার গোনাহের শাস্তি গৃহের ইঁদুরের মধ্যেও আছে বলে জানি।

জনৈক সূফী বর্ণনা করেন— আমি সিরিয়ায় একজন অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী খৃস্টান বালককে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম এবং অপলক দৃষ্টিতে তার সৌন্দর্য সুধা পান করতে লাগলাম। ইতিমধ্যে আমার কাছে ইবনে জালা দামেশকী আগমন করলেন এবং আমার হাত ধরলেন। আমি এভাবে ধরা পড়ে যাওয়ায় ভীষণ লজ্জিত হলাম। অতঃপর কথা বানিয়ে বললাম ঃ এই বালকের মুখাবয়ব দেখে আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছিলাম, এমন অনিন্দ্য সুন্দর মুখও জাহান্নামের অগ্নিতে প্রজ্বলিত হবে? জানি না, এর পেছনে আল্লাহর

কি হেকমত। একথা শুনে ইবনে জালা আমার হাতে চিমটি কেটে বললেন ঃ কয়েক দিন পর তুমি এর শাস্তি পেয়ে যাবে। সূফী বলেন ঃ ত্রিশ বছর পর আমি এর শাস্তি পেয়েছি। আবূ সোলায়মান দারানী (রহঃ) বলেন ঃ স্বপ্নদোষ হওয়াও গোনাহের একটি শাস্তি। তিনি আরও বলেন ঃ নামাযে জামাত না পাওয়ার বিষয়টিও কোন গোনাহ করার কারণে প্রকাশ পায়। এক হাদীসে আছে—

مَا اَنْكَرْتُمْ مِّنْ زَمَانِكُمْ فَبِمَا غَيَّرْتُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ

অর্থাৎ, যামানার যে বিষয় তোমাদের খারাপ লাগে, তাকে তোমাদের আমল বিকৃত করারই ফল মনে কর।

আবু আমর ইবনে হুলওয়ান তার কাহিনীতে লিখেনঃ একদিন আমি নামায পড়ছিলাম, এমন সময় আমার অন্তরে কামভাব মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। আমি এ সম্পর্কে অনেকক্ষণ চিন্তা করলাম এবং শেষ পর্যন্ত তা সমকামিতার খাহেশে রূপান্তরিত হয়ে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ মাটিতে পড়ে গেলাম এবং আমার সমস্ত শরীর কাল হয়ে গেল। লোকলজ্জার ভয়ে আমি তিনদিন পর্যন্ত ভেতরে গা-ঢাকা দিয়ে রইলাম এবং হাম্মামে গিয়ে সাবান দিয়ে শরীর ধৌত করলাম। কিন্তু কালো রঙ বাড়তেই থাকল। তিনদিন পর রঙ পরিষ্কার হল এবং আমি তলব পেয়ে রিক্কা থেকে হযরত জুনায়দ বাগদাদীর খেদমতে বাগদাদ গেলাম। তিনি আমাকে দেখেই বললেন ঃ ছিঃ ছিঃ তোমার লজ্জা হল না। আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তুমি কামভাবে মত্ত হলে, যা তোমাকে আল্লাহর সম্মুখে উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত করে দিয়েছে। যদি আমি দোয়া না করতাম এবং তোমার পক্ষ থেকে তওবা না করতাম, তবে এই কালো রঙ নিয়েই তুমি আল্লাহর কাছে যেতে। আমি বিস্মিত হলাম যে, হযরত জুনায়দ আমার অবস্থা কিরূপে জানলেন! আমি তো রিক্কায় ছিলাম আর তিনি ছিলেন বাগদাদে।

এখানে জানা দরকার যে, মানুষ যখন গোনাহ করে, তখন তার অন্তরের চেহারা কালো হয়ে যায়। যদি সে ভাগ্যবান হয়, তবে কালো রঙ বাইরের দেহেও ফুটে উঠে, যাতে সে গোনাহ থেকে বিরত হতে পারে। পক্ষান্তরে হতভাগ্য হলে কালো রঙ ভেতরেই থেকে যায় এবং শেষ পর্যন্ত সমগ্র অন্তর্ভাগ কালো হয়ে সে দোযখের উপযুক্ত হয়ে যায়।

গোনাহের ফলস্বরূপ দুনিয়াতে যে দারিদ্র্য ও রোগ-ব্যাধি আসে, এ সম্পর্কে অনেক হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু আল্লাহর অনুগত বান্দার অবস্থা ভিন্ন। তার উপর কোন বিপদাপদ এলে, তা তার গোনাহের কাফফারা হয় এবং এ জন্যে সবর করলে তার মর্তবা বেড়ে যায়।

চতুর্থ বর্ণনাযোগ্য বিষয়বস্তু হচ্ছে আলাদা আলাদা গোনাহের জন্যে শরীয়তে যে শাস্তি উল্লিখিত হয়েছে, ওয়াযে তা বর্ণনা করা। উদাহরণতঃ মদ্যপানের অনিষ্ট, যিনা, চুরি, হত্যা, গীবত, অহমিকা এবং হিংসার কুফল আলাদা আলাদা বর্ণনা করবে। এদের প্রত্যেকটি সম্পর্কে অসংখ্য রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, যে ব্যক্তি যে বিষয়ের উপযুক্ত, তার কাছে সেই বিষয়ই বর্ণনা করতে হবে। বিচক্ষণ ডাক্তার যেমন প্রথমে নাড়ী, বর্ণ, গতিবিধি ইত্যাদি পরীক্ষা করে রোগের অভ্যন্তরীণ কারণ জেনে নেয়, এরপর চিকিৎসা করে, আলেমকেও তেমনি অবস্থার ইঙ্গিত দ্বারা মানুষের গোপন দোষগুণ জেনে তাই বর্ণনা করতে হবে, যাতে রসূলে করীম (সাঃ)-এর পূর্ণ অনুসরণ হয়।

বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে আরয করল ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

عَلَيْكُمْ بِالْيَاسِ مِمَّا فِىْ اَيْدِى النَّاسِ فَاِنَّ ذٰلِكَ هُوَ الْغِنٰى وَاِيَّاكَ وَالطَّمَعَ فَاِنَّهُ الْفَقْرُ الْحَاضِرُ وَصَلِّ صَلٰوةَ مُوَدِّعٍ وَاِيَّاكَ مَا تَعْتَذِرُ مِنْهُ ـ

অর্থাৎ, তোমার কর্তব্য অপরের ধনসম্পদ থেকে নিরাশ হওয়া। এটাই ধনাঢ্যতা। তুমি লোভ-লালসা থেকে বেঁচে থাক। কেননা, এটা উপস্থিত দারিদ্র্য। বিদায়ী ব্যক্তির ন্যায় নামায পড়। আর এমন কথাবার্তা থেকে বেঁচে থাক, যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হয়।

অন্য এক ব্যক্তি উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ মিথ্যা কথা বলো না। আরও এক ব্যক্তি উপদেশ চাইলে তিনি বললেন ঃ ক্রুদ্ধ হয়ো না।

জনৈক ব্যক্তি মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'কে বলল ঃ আমাকে উপদেশ দি-ন। তিনি বললেন ঃ আমার উপদেশ হল, তুমি দুনিয়া ও আখেরাতে বাদশাহ হয়ে থেকো। লোকটি বলল ঃ এটা আমার জন্যে কিরূপ সম্ভবপর হবে? তিনি বললেন ঃ দুনিয়াতে সংসার অনাসক্তিকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও।

এখানে রসূলে করীম (সাঃ) প্রথম ব্যক্তির মধ্যে অপরের ধন-সম্পদের প্রতি লোভ-লালসার আলামত প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই তাকে তেমনি আদেশ করেছেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি কথাবার্তার হেরফের লক্ষ্য করেছেন। তাই তাকে মিথ্যা বলতে নিষেধ করেছেন। তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে তিনি ক্রোধের আলামত জানতে পেরেছেন। তাই তাকে ক্রোধ পরিহার করার উপদেশ দিয়েছেন। মোহাম্মদ ইবনে ওয়াসে'ও তার উপদেশপ্রার্থীর মধ্যে অন্তর্দৃষ্টির আলোকে লালসার চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন এবং তদনুযায়ী উপদেশ দিয়েছেন। মোটকথা, প্রার্থীর অবস্থা অনুযায়ী কথাবার্তা হওয়া উচিত—বক্তার যোগ্যতা অনুযায়ী নয়।

হযরত মোয়াবিয়া (রাঃ) একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে লিখলেন ঃ আমার জন্যে সংক্ষিপ্ত উপদেশ সম্বলিত একখানা পত্র লিপিবদ্ধ করুন। হযরত আয়েশা পত্রে লিখলেন ঃ আমি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে বলতে শুনেছি— যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির পরওয়া না করে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মানুষের কোপানল থেকে রক্ষা করেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টির পরওয়া না করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, আল্লাহ তাকে মানুষের কাছেই সঁপে দেন। এ পত্রে হযরত আয়েশার জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা লক্ষণীয় যে, তিনি কিভাবে সে বিপদটিই উল্লেখ করেছেন, যাতে শাসকবর্গ ও আমীর-উমারা লিপ্ত থাকে। অর্থাৎ, মানুষের পক্ষপাতিত্ব করা ও তাদের সন্তুষ্টিকে অগ্রাধিকার দেয়া। একবার তিনি আমীর মোয়াবিয়াকে লিখেছিলেন— আল্লাহকে ভয় করতে থাক। কেননা, আল্লাহকে ভয় করলে তিনি তোমাকে মানুষের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু মানুষকে ভয় করলে আল্লাহর সামনে তোমার কোন জারিজুরি চলবে না। এসব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায়, অন্তর্দৃষ্টির মাধ্যমে গোপন দোষ-গুণ জেনে নেয়া ওয়ায়েযের জন্যে অত্যাবশ্যক, যাতে উপযুক্ত অবস্থা ও সময়ের

চাহিদা অনুযায়ী জরুরী বিষয়টি বর্ণনা করা যায়। প্রত্যেক ব্যক্তিকে যাবতীয় উপদেশ বলে দেয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া যে বিষয় বর্ণনা করার প্রয়োজন নেই, তাতে মশগুল হওয়ার অর্থ সময় নষ্ট করা।

এখানে প্রশ্ন হল, যে ব্যক্তি জনসমাবেশে ওয়ায করে, তার কি করা উচিত? জওয়াব এই যে, এমতাবস্থায় এমন বিষয়বস্তু বর্ণনা করবে যাতে সকল মানুষ শরীক; অর্থাৎ, এমন প্রয়োজনীয় বিষয়, যা জানা সবারই জন্যে উপকারী। শরীয়তের বিষয়াদিতে এটা সম্ভব। কেননা, শরীয়তের বিষয়সমূহ একদিকে যেমন খাদ্য, অপরদিকে তেমনি ঔষধি। খাদ্য সকলের জন্যে এবং ঔষধি রোগগ্রস্তদের জন্যে। এরূপ ওয়াযের দৃষ্টান্ত এই— এক ব্যক্তি হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর ভয়কে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। সকল কল্যাণের মূল এটাই। জেহাদকে নিজের জন্যে অত্যাবশ্যকীয় করে নাও। ইসলামে একেই বৈরাগ্য বলা হয়। সদাসর্বদা কোরআন মজীদ পাঠ কর। এটা তোমার জন্যে পৃথিবীতে আলোকবর্তিকা হবে এবং ঊর্ধ্বজগতের স্মারক হবে। ভাল কথা না হলে চুপ করে থাক। এর মাধ্যমে তুমি শয়তানের উপর বিজয়ী হবে।

হযরত লোকমান (আঃ) তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন ঃ আলেমদের সামনে বিনয়াবনত হয়ে বস, তাদের সাথে তর্ক করো না। করলে তারা তোমাকে খারাপ মনে করবে। দুনিয়াতে জীবন ধারণ করা যায় এই পরিমাণ সম্পদ রেখে অবশিষ্ট উপার্জন আখেরাতের জন্যে ব্যয় কর। সংসার-ধর্ম সম্পূর্ণ বর্জন করো না। তাহলে নিজের বোঝা অন্যের ঘাড়ে চাপাতে হবে এবং অপরের গলগ্রহ হতে হবে। রোযা এমনভাবে রাখ, যা দ্বারা কামশক্তি দমিত হয়— এমন ভাবে রেখো না, যা দ্বারা নামাযে বিঘ্ন দেখা দেয়। কেননা, নামায রোযা অপেক্ষা উত্তম। নির্বোধের কাছে বসো না এবং দ্বিমুখী মানুষের সাথে মেলামেশা করো না। নিজের ধন হারিয়ে অপরের ধনের হেফাযত করো না। বলা বাহুল্য, মৃত্যুর পূর্বে যে ধন দান করা হয়, তা নিজের ধন এবং মৃত্যুর সময় যে ধন রেখে যাওয়া হয়, তা অপরের ধন। প্রিয় বৎস, যে দয়া করে, তার প্রতি দয়া করা হয়। যে চুপ থাকে, সে নিরাপদ থাকে। যে ভাল কথা বলে, সে সওয়াব পায়। যে মন্দ কথা বলে,

সে গোনাহগার হয়। যে রসনা সংযত করে না, সে অনুতাপ করে।

অব্যাহত গোনাহের চিকিৎসার দ্বিতীয় স্তম্ভ হচ্ছে সবর। এর প্রয়োজন এ কারণে হয় যে, রোগীর রোগ বৃদ্ধির একমাত্র কারণ হচ্ছে ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবহার। এই ব্যবহার দু'কারণে হয়ে থাকে—(১) ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা এবং (২) খাহেশের আতিশয্যে ক্ষতির প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করা। ক্ষতি সম্পর্কে অজ্ঞতা ও গাফলতির প্রতিকার উপরে বর্ণিত হয়েছে। এখন শুধু খাহেশের প্রতিকার বাকী।

রোগী যখন কোন ক্ষতিকর বস্তুর প্রতি অত্যধিক আগ্রহান্বিত হয়, তখন প্রথমে সে সেই বস্তুর ক্ষতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হবে। এরপর সেই বস্তুটিকে তার দৃষ্টি থেকে উধাও করে দিতে হবে। এর পরিবর্তে রোগী অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর কোন বস্তু ব্যবহার করবে, যা আকারে প্রথম বস্তুর অনুরূপ হবে। এরপর দ্বিতীয় বস্তুটিও বর্জন করবে এবং এ বর্জনে সবর করবে। মোটকথা, সবরের তিক্ততা সর্বাবস্থায় অপরিহার্য। গোনাহের প্রতি খাহেশের চিকিৎসাও এমনি ভাবে হওয়া উচিত। উদাহরণতঃ যদি কোন যুবকের কামোত্তেজনা থাকে এবং সে তার চক্ষু, অন্তর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করা থেকে বিরত রাখতে সক্ষম না হয়, তবে প্রথমে তার এই গোনাহের ক্ষতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ, কোরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে যে শাস্তিবাণী বর্ণিত রয়েছে, সেগুলো জেনে নেবে। যখন ভয় বেড়ে যাবে, তখন যে সব কারণে কামভাব উত্তেজিত হয়, সেগুলো থেকে সরে যাবে। যদি কোন কিছু দেখা অথবা সম্মুখে পাওয়ার কারণে কামভাব উত্তেজিত হয়, তবে তার চিকিৎসা সেই বস্তু থেকে পালিয়ে একান্তবাস অবলম্বন করা। আর যদি কামোত্তেজনা সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্যের কারণে হয়, তবে তার চিকিৎসা ক্ষুধার্ত থাকা ও সর্বদা রোযা রাখা।

বলা বাহুল্য, উভয় চিকিৎসা সবরের মুখাপেক্ষী। সবর ভয় ছাড়া, ভয় জ্ঞান ছাড়া এবং জ্ঞান অন্তর্দৃষ্টি ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অর্জিত হয় না। সুতরাং প্রথমে ওয়াযের মজলিসে হাযির হয়ে একাগ্রচিত্তে ওয়ায শ্রবণ করা উচিত। এরপর যা শুনবে, তা বুঝার জন্যে চিন্তা-ভাবনা করবে। এতে নিঃসন্দেহে ভয় সৃষ্টি হবে। ভয় প্রবল হলে তার সাহায্যে সবর অর্জিত হবে। ফলে, চিকিৎসার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। এর সাথে সংযুক্ত হবে আল্লাহর তাওফীক।

অতএব, যে ব্যক্তি মনোযোগসহ শ্রবণ করবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার কাজ সহজ করে দেবেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি মনোনিবেশ করবে না এবং ভাল কথাকে মিথ্যা মনে করবে, আল্লাহ ক্রমান্বয়ে তার কাজ কঠিন করে দেবেন।

এখন প্রশ্ন হয় যে, উপরোক্ত বক্তব্যের সারমর্ম ঈমানে গিয়ে ঠেকে। কেননা, সবর ব্যতীত গোনাহ বর্জন করা সম্ভব নয়। সবর ভয় ছাড়া এবং ভয় জ্ঞান ছাড়া অর্জিত হয় না। জ্ঞান তখন অর্জিত হয়, যখন গোনাহের ক্ষতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করে। গোনাহের ক্ষতিকে সত্য বলে বিশ্বাস করা হুবহু আল্লাহ ও রসূলকে সত্য বলে বিশ্বাস করা। এরই নাম ঈমান। অতএব সারকথা হল, যে ব্যক্তি অব্যাহত গোনাহ করে, সে এজন্যে করে যে, তার ঈমান নেই। এর জওয়াব এই যে, অব্যাহতভাবে গোনাহ করার ফলে ঈমান বিলুপ্ত হয়ে যায় না; বরং ঈমানের দুর্বলতার কারণে এ গোনাহ হয়ে থাকে। কারণ, ঈমানদার মাত্রই একথা স্বীকার করে যে, গোনাহ আল্লাহ থেকে দূরত্বের এবং পারলৌকিক শাস্তির কারণ। এরপরেও একাধিক কারণে মানুষ গোনাহ করে থাকে। প্রথম কারণ, যে শাস্তির কথা বলা হয়, তা অনুপস্থিত এবং অদৃশ্য। মানুষ মজ্জাগতভাবে উপস্থিত বস্তু দ্বারা যতটুকু প্রভাবিত হয়, ততটুকু অনুপস্থিত বস্তু দ্বারা হয় না। তাই প্রতিশ্রুত বিষয়ের প্রভাব মানুষের উপর উপস্থিত বিষয়ের তুলনায় দুর্বল হয়ে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ, যে খাহেশ তথা কামভাব গোনাহের কারণ, তার আনন্দ ও স্বাদ নগদ হয়ে থাকে। নগদ আনন্দ অনাগত ভয়ের কারণে ত্যাগ করা স্বভাবতই কঠিন হয়ে থাকে। সেমতে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন ঃ

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ

অর্থাৎ, তোমরা আসলে পার্থিব জীবনকে ভালবাস এবং পরকালকে উপেক্ষা কর।

এ বিষয়টি হাদীস দ্বারাও প্রমাণিত । বলা হয়েছে—

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

অর্থাৎ, অপ্রিয় বিষয়সমূহ দ্বারা জান্নাতকে এবং কামনা-বাসনা দ্বারা জাহান্নামকে ঘিরে রাখা হয়েছে।

অন্য এক হাদীসে এরশাদ হয়েছে—আল্লাহ তা'আলা জাহান্নাম সৃষ্টি করে ফেরেশতা জিবরাঈলকে আদেশ করলেন, গিয়ে দেখে আস। জিবরাঈল জাহান্নাম পরিদর্শন করে আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে কখনও এতে প্রবেশ করবে না। এরপর আল্লাহ তা'আলা জাহান্নামকে কামনা-বাসনা দ্বারা আবৃত করে দিলেন এবং জিবরাঈলকে আদেশ করলেন ঃ এবার গিয়ে দেখে আস। তিনি দেখার পর আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, এখন আমার আশংকা হয়, কেউ এতে প্রবেশ না করে ক্ষান্ত হবে না। এরপর জান্নাত সৃষ্টি করে জিবরাঈলকে তা দেখতে বলা হল। তিনি দেখার পর আরয করলেন ঃ তোমার ইযযতের কসম, যে কেউ এর অবস্থা শুনবে, সে এতে প্রবেশ করতে চাইবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা জান্নাতকে অপ্রিয় বিষয়াদির দ্বারা আবৃত করে জিবরাঈলকে দেখতে বললেন। তিনি দেখে আরয করলেন ঃ এখন আমি আশংকা করি, কেউ এতে প্রবেশ করতে পারবে না। এ থেকে বুঝা গেল, কামনা-বাসনার উপস্থিতি এবং আযাব বিলম্বিত হওয়া এ দুটিই অব্যাহত গোনাহের উন্মুক্ত কারণ; যদিও মূল ঈমান বিদ্যমান থাকে। যে রোগী তীব্র পিপাসার কারণে বরফের পানি পান করে, সে মূল চিকিৎসা বিজ্ঞানকে অস্বীকার করে না এবং পানি তার জন্যে ক্ষতিকর—এ বিষয়টিও অস্বীকার করে না। কিন্তু কামনা-বাসনা প্রবল থাকার কারণে ভবিষ্যত কষ্ট ও ক্ষতি মেনে নেয়া সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় কারণ, গোনাহগার মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তওবার ইচ্ছা পোষণ করে এবং নিজের পাপসমূহকে পুণ্যের দ্বারা মিটিয়ে দিতে চায়। কিন্তু মনে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার আশা প্রবল থাকার কারণে সে সর্বক্ষণ তওবা বিলম্বিত করে।

চতুর্থ কারণ, মুসলমান মাত্রই বিশ্বাস করে যে, গোনাহ এমন শাস্তির কারণ হয় না, যা মাফ হওয়া অসম্ভব। তাই সে গোনাহ করে এবং আল্লাহর কৃপার উপর ভরসা করে তা মাফ হওয়ার প্রত্যাশা রাখে।

উপরোক্ত চারটি বিষয়ই মূল ঈমান থাকা সত্ত্বেও গোনাহের কারণ হয়ে

থাকে। হাঁ, মাঝে মাঝে পঞ্চম একটি কারণেও মানুষ গোনাহ করে থাকে, যদ্দরুন মূল ঈমানেই ত্রুটি দেখা দেয়। তা এই যে, গোনাহগার ব্যক্তি মূলত রসূল (সাঃ)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ পোষণ করে। এরই নাম কুফর।

এখন বর্ণিত পাঁচটি কারণের প্রতিকার জানা দরকার। প্রথম কারণ অর্থাৎ শাস্তি অনুপস্থিত থাকার ক্ষেত্রে চিন্তা করবে যে, যা হওয়ার তা অবশ্যই হবে। যা ভবিষ্যত তা অতীত হয়ে যায়। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে কিয়ামত সন্নিকটবর্তী। আরও চিন্তা করবে যে, আমরা দুনিয়াতে অনাগত আশংকার কারণে বর্তমানে কষ্ট ও শ্রম স্বীকার করি। উদাহরণতঃ কখনও দরিদ্র হয়ে যাব— এই ভয়ে জল ও স্থলে সফর করি এবং অর্থ উপার্জন করি। যদি কোন বিধর্মী চিকিৎসক কোন রোগীকে বলে দেয় ঠাণ্ডা পানি তোমার জন্যে ক্ষতিকর— এতে তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে, তবে রোগীর কাছে ঠাণ্ডা পানি সর্বাধিক সুস্বাদু হলেও মৃত্যুর ভয়ে সে তা পরিত্যাগ করবে। অথচ মৃত্যুকষ্ট এক মুহূর্তের বেশী নয়। এখন চিন্তার বিষয় একজন বিধর্মীর কথায় কিভাবে রোগী সুস্বাদু বস্তু ত্যাগ করে অথচ তার চিকিৎসা যে সত্য ও অব্যর্থ, তার উপর কোন মো'জেযা প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সুতরাং সে মনে মনে বলবে—পয়গম্বরগণের উক্তি, যা মো'জেযা দ্বারা সমর্থিত, একজন বিধর্মীর উক্তির চেয়েও কম বিশ্বাসযোগ্য হবে—এটা আমার বিবেকের কাছে গ্রহণীয় নয় অথবা আমার কাছে দোযখের আযাব মৃত্যুযন্ত্রণার তুলনায় হালকা হবে—এটাও মেনে নেয়া যায় না। কিয়ামতের প্রতিটি দিন দুনিয়ার দিনসমূহের তুলনায় পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে।

এমনি ধরনের চিন্তাভাবনা দ্বারা দ্বিতীয় কারণেরও চিকিৎসা হতে পারে। অর্থাৎ, গোনাহ করার কারণ যদি আনন্দ উপভোগের প্রাবল্য হয়, তবে জোরপূর্বক তা পরিত্যাগ করবে এবং মনে মনে বলবে—ক্ষণস্থায়ী জীবনের আনন্দকে যখন আমি ত্যাগ করতে পারি না, তখন অনন্তকালীন আনন্দ কিরূপে বিসর্জন দেব? যদি সবরের সামান্য কষ্ট সহ্য করতে না পারি, তবে দোযখের অচিন্তনীয় কষ্ট কিরূপে সহ্য করব?

তৃতীয় কারণ অর্থাৎ তওবায় গড়িমসি করার চিকিৎসা হচ্ছে একথা

চিন্তা করা যে, দোযখীরা বেশীর ভাগ এ ফরিয়াদই করবে যে, তারা তওবার সময়কে কেন বিলম্বিত করেছে? এ ছাড়া যে ব্যক্তি গড়িমসি করে, সে তার এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়ের উপর ভিত্তি করে এটা করে যাবে। অর্থাৎ, সে মনে করে নেয় যে, আরও অনেক দিন বাঁচবে। তখন তওবা করে নেবে। প্রশ্ন এই যে, সে জীবিত থাকবে—এটা কিরূপে জানল? তার মরে যাওয়ারও তো সম্ভাবনা রয়েছে। আর যদি জীবিতও থাকে, তবে গোনাহ ত্যাগ না করারও তো সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন এ পর্যন্ত ত্যাগ করতে পারেনি। কারণ, কামনা-বাসনার প্রাবল্য তখনও থেকে যেতে পারে; বরং বেশী দিন অভ্যাসের কারণে তা আরও মযবুত হয়ে যাবে। এসব কারণে যারা গড়িমসি করে, তারা পরিণামে ধ্বংস হয়ে যায়।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি একটি বৃক্ষ সমূলে উৎপাটিত করতে গিয়ে দেখল যে, বৃক্ষটি বেশ মযবুত। কঠিন পরিশ্রম ছাড়া উৎপাটিত করা যাবে না। সে মনে মনে বলল, একে আরও বছর খানেক এমনিতেই রেখে দেই। এরপর উপড়ে ফেলব। সে ভাবেনি যে, যতই দিন যাবে, বৃক্ষের মূল ততই মযবুত হবে এবং সে নিজে যতই বড় হবে, ততই দুর্বল হয়ে পড়বে। দুনিয়াতে এরূপ ব্যক্তির সমান নির্বোধ কেউ হবে না। যখন তার দেহে শক্তি ছিল এবং বৃক্ষ দুর্বল ছিল, তখন সে বৃক্ষটি উপড়ায়নি; বরং এমন সময়ের জন্যে ছেড়ে দিয়েছে, যখন বৃক্ষ হবে ইস্পাতকঠিন এবং সে হবে দুর্বল।

চতুর্থ কারণ অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতের ভরসায় গোনাহ করা— এর চিকিৎসা পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে। এ বিষয়েরই অনুরূপ যে, কেউ নিজের ধনসম্পদ ব্যয় করে নিজেকে এবং পরিবারবর্গকে নিঃস্ব করে দেয় এবং আশা করে যে, আল্লাহ তা'আলা আপন কৃপায় কোন নির্জন জায়গায় ধনভাণ্ডারের সন্ধান বলে দেবেন। এরূপ ধনভাণ্ডার পাওয়া যদিও সম্ভব, মাঝে মাঝে এরূপ হয়ও, কিন্তু এর উপর ভরসা করে যে নিজের ধনসম্পদ বিনষ্ট করে, সে নিরেট বোকা। এমনিভাবে গোনাহ মাফ হওয়াও সম্ভব। কিন্তু এর উপর ভরসা করা মূর্খতা।

পঞ্চম কারণ অর্থাৎ রসূলে করীম (সাঃ)-এর সত্যবাদিতায় সন্দেহ করে গোনাহ করা, এর চিকিৎসা সম্ভব। উদাহরণতঃ সন্দেহকারীকে বলা হবে—আখেরাত সম্পর্কিত যেসব বিষয়কে রসূলুল্লাহ (সাঃ) সত্য

আখ্যায়িত করেছেন, সেগুলো তোমার মতে সম্ভবপর না, অসম্ভব? যদি সে উত্তরে সন্দেহের কথা জানায়, তবে তাকে বলা উচিত— যদি তুমি আপন গৃহে খাদ্যবস্তু রেখে যাও এবং কোন অচেনা ব্যক্তি এসে তোমাকে বলে ঃ তোমার চলে যাওয়ার পর এ খাদ্যে বিষধর সর্প বিষ ছেড়ে দিয়েছে, তবে তুমি তার সত্যবাদিতায় সন্দেহ করে সেই খাদ্য খাবে, না সুস্বাদু হওয়া সত্ত্বেও ত্যাগ করবে? সে এ জবাবই দিবে যে, আমি এই খাদ্য খাব না। কারণ, আমি চিন্তা করব যদি সে মিথ্যা বলে থাকে, তবে ক্ষতি এতটুকুই হবে যে, খাদ্য খাওয়া হল না। এ ব্যাপারে সবর করা কঠিন হলেও সম্ভবপর। পক্ষান্তরে যদি সে সত্য বলে থাকে, তবে নির্ঘাত আমার মৃত্যু হবে, যা না খেয়ে সবর করার তুলনায় অত্যন্ত কঠিন।

এরপর সন্দেহকারীকে বলা হবে— সোবহানাল্লাহ, একজন অপরিচিত ব্যক্তির কথা তুমি মেনে নিতে পার, যা স্বার্থপরতার বশবর্তী হয়ে বলারও সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মো'জেযা সমর্থিত হওয়া সত্ত্বেও পয়গম্বরের উক্তি এবং ওলী, পণ্ডিত, দার্শনিক ও সকল সুধী ব্যক্তির বাণী মেনে নিতে তোমার আপত্তি। মূর্খদের সাথে আমাদের কোন কথা নেই। যারা বুদ্ধিমান, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে কিয়ামতে বিশ্বাস করে না এবং সওয়াব ও আযাবকে সঠিক মনে করে না— যদিও এগুলোর অবস্থা ও প্রকারভেদে মতানৈক্য রয়েছে। যদি তারা সত্যবাদী হয়, তবে তুমি অনন্তকাল আযাব ভোগ করবে। আর যদি তাদের কথা মিথ্যা হয়, তবে তোমার কোন ক্ষতি হবে না; কেবল কতিপয় কামনা-বাসনা থেকে তুমি এ দুনিয়াতে বঞ্চিত থাকবে।

আমাদের এই আলোচনা হযরত আলী (রাঃ)-এর উক্তির অনুরূপ। তিনি আখেরাতের ব্যাপারে সন্দেহকারী জনৈক ব্যক্তিকে বলেছিলেন ঃ যদি তোমার কথা ঠিক হয়, তবে আমরা ও তুমি সকলেই বেঁচে যাব। পক্ষান্তরে আমাদের বিশ্বাস সঠিক হলে আমরা রক্ষা পাব এবং তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।

পঞ্চম অধ্যায়

সবর ও শোকর

হাদীস ও মনীষীদের বাণীর দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ঈমানের দুটি অংশ— একটি সবর, অপরটি শোকর। আল্লাহ্ তা'আলার "আসমায়ে হুসনা" তথা সুন্দর নামসমূহের মধ্যে সাবূর ও শাকূর উভয়টি রয়েছে। তাই সবর ও শোকর যে খোদায়ী গুণাবলী ও আসমায়ে হুসনার অন্তর্ভুক্ত, তা প্রমাণিত। অতএব, এ দুটি বিষয় সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা যেন ঈমানের দুটি অংশ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকা অথবা আল্লাহ্ তা'আলার দুটি গুণ সম্পর্কে গাফেল থাকার নামান্তর।

ঈমান ব্যতীত আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। কোন্ বিষয়ের প্রতি এবং কোন্ ব্যক্তির প্রতি ঈমান আনতে হবে, তা জানা ছাড়া ঈমানের পথে চলা অসম্ভব। যে ব্যক্তি এটা জানার ব্যাপারে শৈথিল্য করবে, সে সবর ও শোকরের সম্যক পরিচয় লাভেও ব্যর্থ হবে। এ থেকে বুঝা গেল, ঈমানের উভয় অংশের যথাযথ বর্ণনা একান্ত জরুরী। তাই আমরা এ অধ্যায়টিকে দুটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে সবর ও শোকর একত্রে বর্ণনা করেছি। কারণ, উভয়ের মধ্যে মিল ও যোগসূত্র অত্যন্ত গভীর।

প্রথম পরিচ্ছেদ

সবর

আল্লাহ্ তা'আলা সবরকারীদেরকে অনেক বিশেষণে বিশেষিত করেছেন এবং কোরআন পাকে সত্তরেরও বেশী জায়গায় সবরের উল্লেখ করেছেন। তিনি অনেক মর্যাদা ও পুণ্যকর্মকে সবরের ফলশ্রুতি সাব্যস্ত করেছেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, তারা যখন সবর করল, তখন আমি তাদের মধ্য থেকে পথ প্রদর্শক করলাম, যারা আমার আদেশে পথপ্রদর্শন করত।

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنٰى عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, তোমার পালনকর্তার কল্যাণের ওয়াদা বনী ইসরাঈলের প্রতি পূর্ণতা লাভ করল এ কারণে যে, তারা সবর করেছিল।

وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

অর্থাৎ, আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম কর্মের বিনিময়ে।

اُولٰئِكَ يُؤْتَوْنَ اَجْرَهُمْ مَّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوْا

অর্থাৎ, তারা তাদের পুরস্কার দু'বার পাবে। কারণ, তারা সবর করেছে।

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে তাদের পুরস্কার বে-হিসাব প্রদান করা হবে।

শেষোক্ত এ আয়াত দ্বারা জানা যায় যে, সবর ব্যতীত অন্যান্য পুণ্যকর্মের সওয়াব বিশেষ পরিমাণ ও হিসাব অনুযায়ী প্রদান করা হবে এবং সবরের সওয়াব বেহিসাব দেয়া হবে। রোযা অর্ধেক সবর হওয়ার কারণে এটি সবরেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

اَلصَّوْمُ لِى وَاَنَا اَجْزِى بِهٖ

অর্থাৎ, রোযা হল আমার জন্যে এবং আমি এর প্রতিদান দেব।

সবরের সওয়াব সম্পর্কে বলা হয়েছে—

وَاصْبِرُوْا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ

অর্থাৎ, তোমরা সবর কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন।

অন্যত্র তিনি স্বীয় সাহায্যকে সবরের সাথে শর্তযুক্ত করে বলেছেন ঃ

بَلٰى اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلَافٍ مِّنَ الْمَلٰئِكَةِ ـ

অর্থাৎ, হাঁ, যদি তোমরা সবর কর, সংযমী হও এবং শত্রু এ মুহূর্তে অতর্কিতে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তবে তোমাদের পালনকর্তা পাঁচ হাজার ফেরেশতা দিয়ে তোমাদের মদদ করবেন।

আরও এক জায়গায় সবরকারীদের জন্যে এমন সব নেয়ামতের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, যেগুলো অন্যদের জন্যে নয়। এরশাদ হয়েছে—

اُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوٰتٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُوْنَ ـ

অর্থাৎ, এই লোকদের প্রতিই তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও অনুকম্পা এবং তারাই সৎপথ প্রাপ্ত।

এ আয়াতে সৎপথ, অনুকম্পা ও ধন্যবাদ সবরকারীদের জন্যে একত্রিত

আছে। মোটকথা, সবরের ফযীলত সম্পর্কে আরও অনেক আয়াত বর্ণিত হয়েছে। এ সম্পর্কে হাদীসের সংখ্যাও অনেক। সেমতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

اَلصَّبْرُ نِصْفُ الْاِيْمَانِ

অর্থাৎ, সবর ঈমানের অর্ধেক।

এক হাদীসে বলা হয়েছে ঃ যেসব বিষয় তোমাদেরকে কম দেয়া হয়েছে, একীন ও সবর সেগুলোর অন্যতম। যে ব্যক্তি এ দুটি বিষয় থেকে যথেষ্ট পরিমাণ প্রাপ্ত হয়, সে তাহাজ্জুদ ও নফল রোযা না করলেও পরওয়া করবে না। তোমরা যদি বর্তমান অবস্থার উপর সবর কর, তবে এটা আমার কাছে এক এক ব্যক্তির সকলের সমপরিমাণ আমল নিয়ে আসার তুলনায় অধিক প্রিয়। কিন্তু আমি আশংকা করি আমার পর তোমাদের সামনে দুনিয়ার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। তোমরা একে অপরকে খারাপ মনে করবে। তখন আকাশের অধিবাসীরা তোমাদেরকে খারাপ মনে করবে। যে ব্যক্তি এ অবস্থায় সওয়াবের নিয়তে সবর করবে, সে তার সওয়াব পুরাপুরি পাবে। এরপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিম্নোক্ত আয়াত তেলাওয়াত করলেন ঃ

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا اَجْرَهُمْ بِاَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ـ

অর্থাৎ, যা তোমাদের কাছে আছে, তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং যা আল্লাহর কাছে আছে, তা অবশিষ্ট থাকবে। আমি সবরকারীদেরকে তাদের প্রাপ্য প্রদান করব তাদের সর্বোত্তম আমলের বিনিময়ে।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে ঈমান কি জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ সবর করা ও দান করা। এক হাদীসে আছে—

اَلصَّبْرُ كَنْزٌ مِّنْ كُنُوْزِ الْجَنَّةِ

অর্থাৎ, সবর জান্নাতের অন্যতম ভাণ্ডার।

একবার এক প্রশ্নের জওয়াবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ঈমান হচ্ছে সবর করা। এর অর্থ, ঈমানের বড় রোকন হচ্ছে সবর করা। বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা হযরত দাউদ (আঃ)-কে ওহী প্রেরণ করেন যে, আমার চরিত্রের মত তুমিও তোমার চরিত্র গঠন কর। আমার চরিত্র এই যে, আমি সাবূর (অধিক সবরকারী)। আতা ইবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেন—রসূলুল্লাহ (সাঃ) আনসারদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেন ঃ তোমরা কি ঈমানদার? সকলেই চুপ করে রইল। হযরত উমর (রাঃ) আরয করলেন ঃ আমরা ঈমানদার। তিনি বললেন ঃ তোমাদের ঈমানের পরিচয় কি? আনসারগণ আরয করলেন ঃ আমরা সুখে শোকর করি, কষ্টে সবর করি এবং আল্লাহর আদেশের উপর সন্তুষ্ট থাকি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ কা'বার পালনকর্তার কসম, তোমরা ঈমানদার। এক হাদীসে আছে—

اَلصَّبْرُ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ অর্থাৎ, অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত ঈসা (আঃ) এরশাদ করেন—অপ্রিয় বস্তুর ব্যাপারে সবর করলেই তুমি তোমার প্রিয় বস্তু লাভ করতে পারবে।

বহু মনীষীগণের উক্তি দ্বারাও সবরের ফযীলত প্রমাণিত হয়। খলীফা হযরত উমর (রাঃ) আবু মূসা আশআরীকে যে পত্র লিখেন, তাতে একথাও লিখিত ছিল— সবরকে নিজের জন্যে অপরিহার্য করে নাও। মনে রেখ, সবর দু'প্রকার এবং একটি অপরটির চেয়ে উত্তম। বিপদে সবর করা ভাল কিন্তু তার চেয়ে উত্তম আল্লাহ তা'আলার বণ্টনে সবর করা। মনে রেখ, সবর ঈমানের মূল। কেননা, সর্বোত্তম নেকী হচ্ছে তাকওয়া, যা সবর দ্বারা অর্জিত হয়। হযরত আলী (রাঃ) বলেন ঃ চারটি স্তম্ভের উপর ঈমানের স্থায়িত্ব নির্ভরশীল—একীন, সবর, জেহাদ ও ইনসাফ। তিনি আরও বলেন ঃ ঈমানের সাথে সবরের সম্পর্ক দেহের সাথে মস্তিষ্কের সম্পর্কের অনুরূপ। সুতরাং মস্তিষ্ক ছাড়া যেমন দেহ কল্পনা করা যায় না, তেমনি যার সবর নেই, তার ঈমান আছে বলা যায় না।

সবরের স্বরূপ ঃ উপরে কোরআন-হাদীসের আলোকে সবরের ফযীলত

বর্ণিত হয়েছে। এখন যুক্তির নিরিখে সবরের শ্রেষ্ঠত্ব জানতে হলে তার স্বরূপ ও মর্ম জানা একান্ত আবশ্যক। তাই এক্ষণে সবরের স্বরূপ বর্ণনা করা হচ্ছে।

প্রকাশ থাকে যে, ধর্মের একটি মকাম (অবস্থান) এবং অধ্যাত্ম পথের একটি মনযিলের নাম সবর। ধর্মের সমস্ত মকাম তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত হয়— (১) মারেফত তথা তত্ত্বজ্ঞান, (২) হাল এবং (৩) আমল। মারেফত সবকিছুর মূল এবং এ থেকেই হালের উদ্ভব হয়। হাল থেকে আমলের বিকাশ ঘটে। সুতরাং মারেফত যেন বৃক্ষসদৃশ, হাল শাখা-প্রশাখা এবং আমল যেন ফলের অনুরূপ। এ বিষয়টি সাধকদের সকল মনযিলেই বিদ্যমান। ঈমান শব্দটি কখনও মারেফতের অর্থে এবং কখনও এই বিষয়ত্রয়ের সমষ্টির অর্থে প্রয়োগ করা হয়। পূর্ণাঙ্গ সবর তখনই হয়, যখন প্রথমে মারেফত অর্জিত হয়, এরপর একটি হাল কায়েম হয়। বাস্তবে এ দুটির নামই সবর। আমল হল ফলসদৃশ, যা এ দুটি বিষয় থেকে প্রকাশ পায়। ফেরেশতা, মানুষ ও পশুর পারস্পরিক ক্রম জানা ছাড়া এটা জানা যায় না। কেননা, সবর মানুষের বৈশিষ্ট্য, যা ফেরেশতা ও পশুর হতে পারে না—ফেরেশতাদের মধ্যে তাদের পূর্ণতার কারণে এবং পশুর মধ্যে অপূর্ণতার কারণে। পশুদের উপর কামনা-বাসনা চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। ফলে, তারা কামনা-বাসনারই অধীন। তাদের চলা-ফেরা ও গতিবিধির কারণ কামনা-বাসনা ছাড়া কিছুই নয়। তাদের মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই, যা কামনা-বাসনার প্রতিবন্ধক হয় এবং তাদেরকে এ থেকে বিরত রাখে। কামনা-বাসনার মোকাবিলায় এরূপ শক্তিকে বলা হবে সবর। পক্ষান্তরে ফেরেশতা সৃজিত হয়েছে আল্লাহ তা'আলার এবাদতে নিয়োজিত থাকার জন্য এবং তাঁর নৈকট্যলাভে সন্তুষ্ট থাকার জন্য। তাদের মধ্যে কামনা-বাসনা রাখা হয়নি, যা তাদেরকে এবাদতের আগ্রহ ও নৈকট্য অর্জনে বাধা দেবে। অপরদিকে মানুষের অবস্থা এই যে, সে শৈশবের শুরুতে পশুর ন্যায় অপূর্ণ সৃজিত হয়েছে। তখন খাদ্যস্পৃহা ছাড়া অন্য কোন কামনা-বাসনা তার মধ্যে থাকে না। কিছুদিন পর তার মধ্যে খেলাধুলা ও সাজসজ্জার কামনা-বাসনা জেগে উঠে। এরপর বিবাহের কামনা-বাসনা প্রকাশ পায়। এসব কামনা তার মধ্যে পর্যায়ক্রমে প্রকাশ পায় এবং শুরুতে

সবর থাকে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কৃপায় মানুষকে সৃষ্টির সেরারূপে সৃষ্টি করেছেন এবং তার মর্যাদা পশুর ঊর্ধ্বে রেখেছেন। তাই যখন তার অস্তিত্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে এবং সে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তখন তার মধ্যে দু'জন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হয়। তাদের একজন তাকে সৎপথ প্রদর্শন করে এবং অপরজন এ কাজে তাকে সাহায্য করতে থাকে। এ ফেরেশতাদ্বয়ের সাহায্যে মানুষ পশু থেকে স্বতন্ত্র হয়।

এ ছাড়া এই ফেরেশতাদ্বয়ের কারণেই মানুষের মধ্যে দুটি বিশেষ গুণের বিকাশ ঘটে—(১) আল্লাহ ও রসূলের মারেফত এবং (২) শুভ-অশুভ পরিণামের জ্ঞান। পশুরা না আল্লাহ ও রসূলকে চিনে, না শুভ পরিণামের চিন্তা করতে পারে। বরং তারা শুধু তাই দেখে, যা কার্যত তাদের কামনা-বাসনার অনুকূলে। এ কারণে সুস্বাদু খাদ্য ছাড়া অন্য কোন বস্তু তারা অন্বেষণ করে না। পক্ষান্তরে মানুষ হেদায়াতের নূরের মাধ্যমে জানে যে, কামনা-বাসনার অনুসরণ করার পরিণতি তার জন্যে অশুভ। কিন্তু কেবল এ হেদায়াতই যথেষ্ট নয়, বরং ক্ষতিকর বস্তু পরিত্যাগ করার ক্ষমতাও তার থাকতে হবে। কারণ, অনেক ক্ষতিকর বস্তু মানুষের জানা আছে, কিন্তু সে সেগুলোকে প্রতিহত করতে পারে না। এমতাবস্থায় কামনা-বাসনাকে ধাক্কা দিয়ে দূরে সরিয়ে দেয়ার জন্যে আল্লাহ তা'আলা আরও একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন। সে মানুষকে কল্যাণের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে এবং অদৃশ্য বাহিনীর মাধ্যমে তাকে শক্তি ও সমর্থন যোগায়। এ বাহিনীকে কামনা-বাসনার বাহিনীর সাথে সদা লড়াই করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ যুদ্ধে কখনও সে দুর্বল এবং কখনও প্রবল হয়। এ দুর্বলতা ও প্রবলতা ততটুকুই হয়ে থাকে, যতটুকু সে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে অদৃশ্য সমর্থনপ্রাপ্ত হয়।

এখন যে বাহিনীর দ্বারা মানুষ কামনা-বাসনাকে পরাভূত করে পশুর স্তর থেকে স্বাতন্ত্র্য অর্জন করে, আমরা তার নাম রাখব ধর্মীয় প্রেরণা। আর কামনার বাহিনীকে বলব শয়তানী প্রেরণা। কল্পনা করা উচিত যে, উভয় প্রেরণার মধ্যে তুমুল যুদ্ধ চলছে। কখনও ধর্মীয় প্রেরণা প্রবল হয় এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা শক্তিশালী হয়। এ যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের অন্তর। ধর্মীয় প্রেরণা ফেরেশতাদের কাছ থেকে এবং শয়তানী প্রেরণা শয়তানদের কাছ থেকে সাহায্য পায়। এ যুদ্ধে শয়তানী প্রেরণার মোকাবিলায় ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড় থাকাই হচ্ছে সবরের স্বরূপ। অটল থাকার পর যদি সে প্রতিপক্ষকে পরাভূত করে এবং কামনার বিরোধিতায় সদা প্রস্তুত থাকে, তবে সে সবরকারীদের তালিকায় স্থান পাবে। পক্ষান্তরে যদি দুর্বল হয় এবং কামনার কাছে পরাভূত হয়ে যায়, তবে সে শয়তানের অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এ বর্ণনা থেকে জানা গেল যে, কামনাজনিত ক্রিয়াকর্ম ত্যাগ করা এমন একটি আমল, যা সবর থেকে উৎপন্ন হয়।

কামনা-বাসনা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের দুশমন—এ বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে ধর্মীয় প্রেরণায় অটল ও অনড় থাকার মূল উৎপত্তি স্থল। বলা বাহুল্য, এ জ্ঞানকেই বলা হয় ঈমান। যখন এ জ্ঞান শক্তিশালী হয়, তখন ধর্মীয় প্রেরণাও শক্তিশালী হয়। ফলে মানুষের কাজকর্ম কামনা-বাসনার বিপরীতে আত্মপ্রকাশ করে। আল্লাহ তা'আলা উপরে বর্ণিত দু'জন ফেরেশতাকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা মানুষের ধর্মীয় প্রেরণা ও শয়তানী প্রেরণার প্রতি নযর রাখে। তাদেরকে বলা হয় "কেরামান কাতেবীন"। যে ফেরেশতা হেদায়াত করে, সে ডানদিকে এবং যে ফেরেশতা শক্তি যোগায়, সে বামদিকে থাকে। মানুষ যখন গাফেল ও অমনোযোগী হয়, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাথে অসদাচরণ করে। তাই এ অসদাচরণকে সে গোনাহ হিসাবে লিখে নেয়। আর যখন মানুষ চিন্তা-ভাবনা করে এবং সৎকাজে তৎপরতা প্রদর্শন করে, তখন যেন সে ডানদিকের ফেরেশতার সাথে সদাচরণ করে। তাই এ মনোযোগকে পুণ্য হিসাবে লিখে নেয়া হয়। এমনিভাবে মানুষ যখন অকাতরে গোনাহ করতে থাকে, তখন যেন সে বামদিকের ফেরেশতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার সাহায্য ও সমর্থন প্রত্যাশা করে না। এ কারণে সে গোনাহ লিখে নেয়। আর যখন মানুষ নফসের বিরুদ্ধে জেহাদ করে, তখন যেন সে এ ফেরেশতার কাছে সাহায্য ও শক্তি প্রত্যাশা করে। ফলে, সে এ কাজকে পুণ্য হিসাবে লিখে নেয়।

কেরামান কাতেবীন রচিত মানুষের গোপন আমলনামা দু'বার খোলা হবে। একবার ক্ষুদ্র কিয়ামতে এবং একবার বৃহৎ কিয়ামতে। ক্ষুদ্র কিয়ামত

বলে আমাদের উদ্দেশ্য মৃত্যু। হাদীসে বলা হয়েছে—

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهُ

অর্থাৎ, যে মৃত্যুবরণ করে, তার কিয়ামত কায়েম হয়ে যায়।

এই কিয়ামতে মানুষ একা থাকে এবং তাকে বলা হয়—

لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

অর্থাৎ, তোমরা একজন একজন করে আমার কাছে আগমন করেছ, যেমন আমি প্রথমবার তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলাম।

আল্লাহ আরও বলবেন ঃ

كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا

অর্থাৎ, আজ নিজের জন্যে তুমিই যথেষ্ট হিসাব গ্রহণকারী।

কিন্তু বৃহৎ কিয়ামতে মানুষ একা থাকবে না; বরং জনসমাবেশের সামনে হিসাব গ্রহণ করা হবে। এ কিয়ামতে সৎলোক জান্নাতে এবং অপরাধী দোযখে দলে দলে প্রবেশ করবে। একজন একজন করে নয়।

সবরের বিভিন্ন নাম ঃ সবর দু'প্রকার— (১) দৈহিক সবর; যেমন দৈহিক কষ্ট সহ্য করা এবং তাতে সুদৃঢ় থাকা এবং (২) মানসিক সবর; যেমন মনকে কুপ্রবণতা ও কুপ্রবৃত্তি থেকে ফিরিয়ে রাখা। প্রথম প্রকার সবর আবার দু'শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথম যেমন নিজে কোন কঠিন কাজ কিংবা এবাদত পালন করা এবং দ্বিতীয়, যেমন অপরের কঠিন প্রহার অথবা মারাত্মক যখম বরদাশত করা। এ ধরনের সবর শরীয়ত অনুযায়ী হলে উত্তম —নতুবা নয়। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবর সর্বাবস্থায় উত্তম। এ সবর যদি উৎকৃষ্ট খাদ্য ভক্ষণ ও যৌনাঙ্গের বাসনা থেকে করা হয়, তবে এর নাম হয় "ইফফত" (সাধুতা)। যদি কোন বিপদাপদে এ সবর করা হয়, তবে একে সবরই বলা হয় এবং এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় হা-হুতাশ করা। যদি বিত্ত-বৈভবের তাড়না সহ্য করার ক্ষেত্রে এ সবর করা হয়, তবে একে বলা হয়, "যবতে নফস" (আত্মসংযম)। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা

হয় আস্ফালন। যদি যুদ্ধক্ষেত্রে সবর করা হয়, তবে একে বলা হয় বীরত্ব ও শৌর্য। এর বিপরীত অবস্থাকে বলা হয় কাপুরুষতা। যদি ক্রোধ হযম ব্যাপারে সবর হয়, তবে এর নাম সহনশীলতা, যার বিপরীত হচ্ছে ক্রোধান্ধতা। যদি যামানার কোন আপদে সবর করা হয়, তবে এর নাম অসম সাহসিকতা এবং এর বিপরীত হচ্ছে স্বল্প সাহসিকতা। প্রয়োজনাতিরিক্ত জীবনোপকরণের বেলায় সবর করা হলে তার নাম সংসার নির্লিপ্ততা। এর বিপরীত সংসারাসক্তি। সারকথা, ঈমানের অধিকাংশ গুণাবলীই সবরের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই একবার জনৈক ব্যক্তি ঈমান কি প্রশ্ন করলে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সবর। এরূপ বলার কারণ এই যে, ঈমানের কর্মসমূহের মধ্যে সর্ববৃহৎ ও ভারী কর্ম হচ্ছে সবর। আল্লাহ তা'আলা সবরের প্রকারসমূহকে একত্রে উল্লেখ করে সবগুলোর নাম রেখেছেন সবর। এরশাদ হয়েছে—

وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ .

অর্থাৎ, যারা কষ্টে, দুর্ভিক্ষে এবং যুদ্ধের সময় সবর করে, তারাই সাচ্চা এবং তারাই খোদাভীরু।

সবরের প্রকারভেদ ঃ প্রকাশ থাকে যে, শয়তানী প্রেরণার সাথে সংঘর্ষের দিক দিয়ে ধর্মীয় প্রেরণার তিন প্রকার অবস্থা হয়ে থাকে। (১) শয়তানী প্রেরণাকে এমনভাবে পরাভূত করে দেয়া যাতে তার মধ্যে মোকাবিলা করার কোন ক্ষমতা অবশিষ্ট না থাকে। সার্বক্ষণিক সবর দ্বারা এই অবস্থা অর্জিত হয়। এরূপ অবস্থায়ই বলা হয় مَنْ صَبَرَ ظَفَرَ যে সবর করে, সে সফলকাম হয়। খুব কম লোকই এ অবস্থায় পৌঁছতে পারে। যারা পৌঁছতে সক্ষম হয়, তারা সিদ্দীক ও নৈকট্যশীল। তাঁরা আল্লাহ তা'আলাকে নিজের পালনকর্তা জেনে তাঁর উপরই সদা প্রতিষ্ঠিত থাকেন এবং কখনও সরল পথ বর্জন করেন না। (২) শয়তানী প্রেরণায় বিজয়ী হওয়া এবং ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে মোকাবিলা করার শক্তি অবশিষ্ট না থাকা। এ অবস্থায়ই মানুষ নৈরাশ্যের শিকার হয়ে সর্বপ্রকার মোজাহাদা ও চেষ্টা-চরিত্র

থেকে বিরত থাকে এবং গাফেলদের তালিকাভুক্ত হয়ে যায়। বাস্তবে এরূপ লোকদের সংখ্যাই অধিক। এরাই রিপু ও খেয়াল-খুশীর পূজারী। এদের প্রতিই নিম্নোক্ত আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে—

وَلَوْشِئْنَا لَاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلٰكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّىْ لَاَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ـ

অর্থাৎ, আমি ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে সরল পথের দিশা দিতে পারতাম; কিন্তু আমার পক্ষ থেকে এ উক্তি সত্যে পরিণত হয়েছে যে, আমি মানব ও জিন দ্বারা জাহান্নাম ভর্তি করে দেব।

এরূপ লোকেরাই আখেরাতের বিনিময়ে পার্থিব জীবনকে গ্রহণ করে এবং চরমভাবে মার খায়। কেউ তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতে চাইলে তাকে আল্লাহর পক্ষ থেকে আদেশ করা হয় ঃ

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰي عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ـ

অর্থাৎ, তুমি সে ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও, যে আমার উপদেশের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে এবং পার্থিব জীবন ছাড়া অন্য কিছু কামনা করে না। তাদের জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই।

এ অবস্থার পরিচয় হচ্ছে চেষ্টা-চরিত্র থেকে নিরাশ হওয়া এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে গর্বিত থাকা। এটা চরম নির্বুদ্ধিতা। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْاَحْمَقُ مَنِ اتَّبَعَ هَوَاهَا وَتَمَنّٰي عَلَى اللّٰهِ ـ

অর্থাৎ, বিজ্ঞ সে ব্যক্তি, যে নিজেকে সংযত রাখে এবং মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার জন্যে আমল করে। আর নির্বোধ সে ব্যক্তি, যে খেয়ালখুশীর অনুসরণ করে এবং আল্লাহর কাছে বাসনা করে।

অর্থাৎ, কেউ তাকে উপদেশ দিলে সে বলে, আমি তওবা করার খুব ইচ্ছা রাখি; কিন্তু তা হয়ে উঠে না। তাই এর আশাও করি না। আর তওবার প্রতি আগ্রহ না থাকলে বলে, আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়ালু। অতএব, তওবার প্রয়োজন কি?

(৩) তৃতীয় অবস্থা হল, মোকাবিলা সমান সমান হওয়া। কখনও ধর্মীয় প্রেরণা বিজয়ী হবে এবং কখনও শয়তানী প্রেরণা। এরূপ ব্যক্তি জেহাদকারীদেরই অন্তর্ভুক্ত। বিজয়ীদের মধ্যে গণ্য নয়। তার অবস্থা নিম্নোক্ত আয়াতে বিধৃত হয়েছে—

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَاٰخَرَ سَيِّئًا

অর্থাৎ, তারা একটি সৎকাজ ও অপরটি অসৎকাজ মিশ্রিত করেছে।

আর যারা কামনা-বাসনার সাথে জেহাদ করে না, তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তার চেয়েও অধম। কেননা, চতুষ্পদ জন্তুর জন্যে মারেফত ও ক্ষমতা সৃষ্টি করা হয়নি যা দ্বারা তারা জেহাদ করবে। কিন্তু মানুষকে ক্ষমতা দান করা হয়েছে, যা সে কাজে লাগায় না।

সহজ ও কঠিন হওয়ার দিক দিয়েও সবর দু'প্রকার। এক, এমন সবর, যা সহজলভ্য নয়, কঠোর পরিশ্রম সাপেক্ষ। এর নাম জোরপূর্বক সবর। দুই, যা পরিশ্রম ছাড়াই অর্জিত হয়ে যায়। মানুষ যখন সদাসর্বদা তাকওয়া অবলম্বন করে এবং শুভ পরিণামের দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, তখন সবর সহজলভ্য হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন—

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰي وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى

অর্থাৎ, অতএব যে দান করে, আল্লাহকে ভয় করে এবং পুণ্যকর্মকে সত্য জ্ঞান করে, আমি তাকে সহজে লক্ষ্যে পৌঁছে দেব।

মোটকথা, দীর্ঘদিন অভ্যাসের ফলে যখন সবর সহজ হয়ে যায়, তখন "রেযা" অর্থাৎ সন্তুষ্টির মকাম হাসিল হয়। কারণ রেযার মর্তবা সবরের উর্ধ্বে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اُعْبُدُوا اللّٰهَ عَلَى الرِّضَاءِ فَاِنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَفِى الصَّبْرِ عَلٰى مَا تَكْرَهُ خَيْرٌ كَثِيْرٌ۔

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর এবাদত কর সন্তুষ্টির মাধ্যমে। যদি তা সম্ভব না হয়, তবে অপ্রিয় বিষয়ে সবর করার মধ্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

জনৈক সাধক বলেন ঃ সবরকারীদের তিনটি স্তর রয়েছে। এক, খাহেশ বর্জন করা। এটা তওবাকারীদের স্তর। দুই, তাকদীরে সন্তুষ্ট থাকা। এটা সংসারত্যাগীদের স্তর। বলা বাহুল্য, মহব্বতের মর্তবা রেযার মর্তবারও উর্ধ্বে। এসব মর্তবা বিশেষ এক প্রকার সবরে সম্ভবপর আর তা হচ্ছে বালা-মুসীবতে সবর করা।

এখন জানা দরকার যে, কতক সবর ফরয, কতক নফল, কতক মাকরূহ এবং কতক হারাম। শরীয়তের নিষিদ্ধ কর্মসমূহে সবর করা ফরয। মাকরূহ বিষয়াদিতে সবর করা নফল। যে পীড়ন শরীয়তে নিষিদ্ধ তাতে সবর করা হারাম। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তির বিবাহিতা স্ত্রীর সাথে অপর এক ব্যক্তি ব্যভিচার করার সংকল্প করল। এতে তার আত্মমর্যাদাবোধ মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। কিন্তু সে তা প্রকাশ করার ব্যাপারে সবর করল এবং চুপচাপ দেখে গেল। বলা বাহুল্য, এ ক্ষেত্রে সবর করা সম্পূর্ণ হারাম। যে পীড়ন শরীয়তে মাকরূহ—হারাম নয়, তাতে সবর করা মাকরূহ। মোটকথা, সবরের কষ্টিপাথর জানা দরকার। সবর ঈমানের অর্ধেক কেবল একথা জেনে মনে করা উচিত নয় যে, সকল সবরই উত্তম।

সর্বাবস্থায় সবরের প্রয়োজনীয়তা ঃ মানুষ জীবনে যেসকল অবস্থার সম্মুখীন হয়, সেগুলো হয় তার ইচ্ছা ও বাসনার অনুকূলে, না হয় প্রতিকূলে হয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, অনুকূল ও প্রতিকূল উভয় অবস্থাতে সবরের প্রয়োজন রয়েছে। যে সকল অবস্থা মানুষের খাহেশের অনুকূল হয়ে থাকে, সেগুলো হচ্ছে স্বাস্থ্য, সুস্থতা, ধন-সম্পদ, জাঁকজমক, জনবল, ধনবল, বেশী সংখ্যক চাকর-নওকর ও বিলাস-ব্যসনের সামগ্রী মওজুদ থাকা। এ সকল অবস্থায় সবর করার প্রয়োজন অত্যধিক। কেননা, মানুষ যদি পার্থিব আনন্দ-উল্লাসে মেতে নিজেকে সংযত না করে এবং এগুলোতে আকণ্ঠ

নিমজ্জিত থাকে, তবে সে আনন্দ-উল্লাস বৈধ হলেও অবশেষে সে নাফরমানী ও ধৃষ্টতার পর্যায়ে পৌঁছে যাবে। কারণ, সাধারণ রীতি অনুযায়ী মানুষ যখন ঐশ্বর্যশালী ও অমুখাপেক্ষী হয়ে যায়, তখনই ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে থাকে। কোরআন পাকে বলা হয়েছে—

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰى اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى

অর্থাৎ, মানুষ সীমালংঘন করেই থাকে। কারণ, সে নিজেকে অভাবমুক্ত ও অমুখাপেক্ষী মনে করে।

জনৈক সাধক বলেন ঃ বালা-মুসীবতে ঈমানদার সবর করে; কিন্তু নিরাপত্তায় সবর করা কেবল সিদ্দীকের কাজ। হযরত সহল তস্তরী (রহঃ) বলেন ঃ বালা-মুসীবতে সবর করার তুলনায় সচ্ছলতায় সবর করা অত্যন্ত কঠিন। যখন দুনিয়ার ধনসম্পদ সাহাবায়ে কেরামের হাতে আসতে থাকে, তখন তারা বললেন ঃ বিপদাপদ ও দারিদ্র্যে আমাদের পরীক্ষা নেয়া হলে আমরা সবর করলাম, কিন্তু যখন আমরা সচ্ছলতা ও নিরাপত্তার পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলাম, তখন আমরা সবর করতে পারলাম না। আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির ফেতনা সম্পর্কে আমাদেরকে হুশিয়ার করেছেন—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ,হে মুমিনগণ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল না করে।

আরও বলা হয়েছে—

اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ

অর্থাৎ, তোমাদের কিছু কিছু স্ত্রী-পুত্র-পরিজন তোমাদের দুশমন। অতএব তাদের ব্যাপারে সাবধান থাক।

রসূলে করীম (সাঃ) বলেন ঃ

الولد مبخلة مجبنة محزنة

অর্থাৎ, সন্তান মানুষকে কৃপণতা, ভীরুতা ও দুঃখ-দুর্দশায় লিপ্ত করে দেয়।

একবার তিনি নিজের কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হাসানকে যখন জামায় জড়িয়ে গিয়ে পড়ে যেতে দেখলেন, তখন মিম্বর থেকে নেমে তাকে কোলে তুলে নিলেন এবং বললেন ঃ আল্লাহ ঠিকই বলেছেন ঃ

إنما أموالكم وأولادكم فتنة

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ফেতনা স্বরূপ।

আমি আমার সন্তানকে টলমল করতে দেখে স্থির থাকতে পারলাম না এবং তাকে তুলে নিলাম। হে বুদ্ধিমানগণ! এর ফলাফল চিন্তা করুন। অতএব, জানা গেল, নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা সত্যিকার সাহসিকতার কাজ। সচ্ছলতায় সবর করার অর্থ হচ্ছে তৎপ্রতি আগ্রহ না করা এবং মনে করা যে, এটা ক্ষণস্থায়ী আমানত মাত্র, যা অচিরেই হাতছাড়া হয়ে যাবে। ধনৈশ্বর্যে তুষ্ট হওয়া এবং বিলাস-ব্যসনে ডুবে থাকা কিছুতেই উচিত নয়। বরং আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের দ্বারা আল্লাহর হক আদায় করা দরকার। উদাহরণতঃ ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে, অপরের দৈহিক সাহায্য করে এবং মুখে সত্য কথা বলে তাঁর হক আদায় করতে হবে। এ ধরনের সবর শোকরের সাথে সংলগ্ন। শোকরে সুদৃঢ় না হওয়া পর্যন্ত এই সবর পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

নিরাপত্তা ও সচ্ছলতায় সবর করা যে অধিক কঠিন, তার অন্যতম কারণ এই যে, এতে ক্ষমতা থাকে। নতুবা যার ক্ষমতাই নেই, সে সবর না করে কি করবে? উদাহরণত ঃ যদি ক্ষুধার্ত ব্যক্তির সামনে খাদ্য না থাকে, তবে সে সহজেই সবর করতে পারে। কিন্তু যদি উৎকৃষ্ট ও সুস্বাদু আহার্য উপস্থিত থাকে, তবে সবর করা নিঃসন্দেহে কঠিন।

পক্ষান্তরে যে সব অবস্থা মানুষের খাহেশের প্রতিকূল হয়ে থাকে, সেগুলো তিন প্রকার। প্রথম, যে সব অবস্থা মানুষের এখতিয়ারাধীন; যেমন এবাদত ও নাফরমানী। দ্বিতীয়, যা এখতিয়ারাধীন নয়; যেমন বিপদাপদ ও

দুর্ঘটনা। তৃতীয়, শুরুতে এখতিয়ারাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা এখতিয়ারাধীন; যেমন পীড়নকারীর কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া। বলা বাহুল্য, এই তিন অবস্থাতেই সবর করা প্রয়োজন।

এবাদতে সবর করা কঠিন। কেননা, মানুষ স্বভাবগতভাবে দাসত্বকে ঘৃণা করে এবং প্রভুত্বের অভিলাষ পোষণ করে। জনৈক সাধু ব্যক্তি বলেন ঃ প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সে অভিলাষ আত্মগোপন করে আছে, যা ফেরাউন أنا ربكم الأعلى অর্থাৎ, 'আমি তোমাদের সুমহান প্রভু' বলে প্রকাশ করেছিল। কিন্তু ফেরাউন তা প্রকাশ করার সুযোগ পেয়েছিল। কারণ,তার সম্প্রদায় তার কথা মেনে নিয়েছিল। অন্যরা এই অভিলাষ প্রকাশ করার সুযোগ না পেলেও অন্তরে গোপন রাখে। তাই চাকর-বাকর ও অনুগতরা কাজে ত্রুটি করলে মানুষ রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে যায় এবং তাদের ত্রুটিকে অসম্ভব মনে করে। এর কারণ অভ্যন্তরীণ অহংকার এবং প্রভুত্বের দাবী ছাড়া আর কি হতে পারে? এ থেকে জানা যায়, দাসত্ব সর্বাবস্থায় কঠিন। এছাড়া কতক এবাদত অলসতার কারণে অপ্রিয় মনে হয়. যেমন নামায। কতক কৃপণতার কারণে দুঃসাধ্য মনে হয়, যেমন যাকাত। কতক এবাদত অলসতা ও কৃপণতা উভয়ের কারণে দুরূহ ঠেকে; যেমন হজ্জ ও জেহাদ। সুতরাং এবাদতে সবর করার মানে অনেকগুলো কঠিন কাজে সবর করা।

এবাদত দু'প্রকার ঃ ফরয ও নফল। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা উভয়টি একত্রে উল্লেখ করেছেন—

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى

অর্থাৎ, আল্লাহ ইনসাফ, অনুগ্রহ ও আত্মীয়কে দান করার আদেশ করেন। এখানে ইনসাফ ফরয, অনুগ্রহ নফল এবং আত্মীয়কে দান করা মানবতা। এদের প্রত্যেকটিতেই সবর করার প্রয়োজন রয়েছে।

দ্বিতীয় প্রকার অর্থাৎ, গোনাহেও সবর করতে হবে। আল্লাহ তা'আলা এ আয়াতে সকল প্রকার গোনাহ একত্রিত করেছেন—

وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ

অর্থাৎ, নির্লজ্জতা, মন্দকাজ ও অবাধ্যতার কাজ করতে নিষেধ করে।

রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

اَلْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ السُّوْءَ وَالْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ هَوَاهُ

অর্থাৎ, মোহাজির সে ব্যক্তি, যে মন্দকাজ পরিহার করে এবং মোজাহিদ তাকে বলা হয়, যে আপন খেয়াল-খুশীর সাথে জেহাদ করে।

যে সব গোনাহে মানুষ অভ্যস্ত হয়ে যায়, সেগুলোতে সবর করা অধিক কঠিন হয়ে থাকে। কেননা, মনের খাহেশের সাথে যখন অভ্যাস যোগ হয়, তখন শয়তানের দুটি বাহিনী পরস্পরে মিলেমিশে একে অপরকে সাহায্য করে এবং ধর্মীয় প্রেরণার মোকাবিলা করে। এরপর যদি সে গোনাহ সহজসাধ্য হয়, তবে তাতে সবর করা মুশকিল। উদাহরণতঃ গীবত, মিথ্যা, কলহ-বিবাদ, আত্মপ্রশংসা ইত্যাদিতে সবর করা খুবই কঠিন।

তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ, যে সকল অবস্থা শুরুতে এখতিয়ারাধীন নয়; কিন্তু তা দূর করা এখতিয়ারাধীন; যেমন কেউ কাউকে কথা অথবা কাজের মাধ্যমে পীড়ন করল। এতে সবর করা এবং প্রতিশোধ না নেয়া কখনও ওয়াজিব এবং কখনও মোস্তাহাব। জনৈক সাহাবী বলেন ঃ পীড়নে সবর না করা পর্যন্ত আমরা কারও ঈমান সম্পর্কে জানতাম না। কোরআন পাকে পয়গম্বরগণের পক্ষ থেকে বিরুদ্ধবাদীদের জওয়াবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَنَصْبِرَنَّ عَلٰى مَا اٰذَيْتُمُوْنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ-

অর্থাৎ, তোমরা আমাদেরকে যে পীড়ন কর, তাতে আমরা সবর করব। ভরসাকারীদের আল্লাহর উপর ভরসা করা উচিত।

রসূলুল্লাহ (সাঃ) একবার কিছু অর্থ বণ্টন করলে কিছু সংখ্যক বেদুইন মুসলমান বলাবলি করল ঃ এ বণ্টনে আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি কামনা করা হয়নি। এ সংবাদ রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কানে পৌঁছলে তাঁর মুখমন্ডল বিবর্ণ

হয়ে গেল। তিনি বললেন ঃ আল্লাহ আমার ভাই মূসা (আঃ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে এর চেয়েও বেশী পীড়ন করা হয়েছে। কিন্তু তিনি সবর করেছেন। কোরআনের বিভিন্ন স্থানে রসূলে করীম (সাঃ)-কে সবর করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত উল্লেখ করা হল ঃ

وَدَعْ اَذٰهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ

অর্থাৎ, প্রত্যাখ্যান করুন তাদের পীড়ন এবং ভরসা করুন আল্লাহর উপর।

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا

অর্থাৎ, তাদের বলাবলিতে সবর করুন এবং সুন্দরভাবে তাদেরকে পরিত্যাগ করুন।

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السَّاجِدِيْنَ

অর্থাৎ, আমি জানি তাদের কথাবার্তায় আপনার মন সংকুচিত হয়। অতএব, আপনি নিজের পালনকর্তার সপ্রশংস পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তাঁকে সেজদা করুন।

لَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اَذًى كَثِيْرًا وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ -

অর্থাৎ, আপনি পূর্ববর্তী গ্রন্থপ্রাপ্ত ও মুশরিকদের পক্ষ থেকে অনেক মন্দকথা শুনবেন। অতঃপর যদি আপনি সবর করেন ও তাকওয়া অবলম্বন করেন, তবে এটা হবে সাহসিকতার কাজ।

এখানে বদলা নেয়ার ব্যাপারে সবর করাই উদ্দেশ্য। এ কারণে এ সবরের মর্যাদা অনেক। আল্লাহ তা'আলা কেসাস ইত্যাদি ব্যাপারে ক্ষমাকারীর প্রশংসা করেছেন। বলা হয়েছে ঃ

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ.

অর্থাৎ, যদি তোমরা প্রতিশোধ নাও, তবে ততটুকুই নাও, যতটুকু কষ্ট তোমরা পেয়েছ। আর যদি সবর কর, তবে তা সবরকারীদের জন্যে উত্তম।

রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ وَاعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ

অর্থাৎ, যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর। যে তোমাকে বঞ্চিত করে, তুমি তাকে দান কর। যে তোমার উপর যুলুম করে, তুমি তাকে ক্ষমা কর।

ইনজীলে হযরত ঈসা (আঃ) -এর এই উক্তি বর্ণিত রয়েছে— পূর্ব থেকে তোমাদের প্রতি নির্দেশ আছে যে, দাঁতের বদলে দাঁত, নাকের বদলে নাক অর্থাৎ, যতটুকু অনিষ্ট তোমার করা হয়, তুমি প্রতিপক্ষের ততটুকু অনিষ্টই কর। কিন্তু আমি বলি অনিষ্টের বদলে অনিষ্ট করো না। কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে তুমি তার সামনে বাম গাল পেতে দাও। কেউ তোমার চাদর নিয়ে গেলে তুমি তাকে লুঙ্গিও দিয়ে দাও। কেউ তোমাকে এক মাইল অনর্থক নিয়ে গেলে তুমি তার সাথে দু'মাইল যাও। এসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, পীড়নে সবর করা সবরের সর্বোচ্চ স্তর।

এ ছাড়া আরও কতিপয় বিষয়ে সবর করা দরকার, সেগুলোর আদি-অন্ত কোনটিই বান্দার এখতিয়ারাধীন নয়। যেমন, প্রিয়জনের মৃত্যু, ধন-সম্পদ বিনষ্ট হওয়া, স্বাস্থ্যহানি হওয়া, বিকলাঙ্গ হওয়া ইত্যাদি। এগুলোতে সবর করাও উচ্চস্তরের সবর। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ কোরআন মজীদে তিন বিষয়ে সবরের কথা আছে। (১) ফরয আদায়ে সবর করা। এর সওয়াব তিনশ' মাত্রা পর্যন্ত। (২) আল্লাহ তা'আলার হারামকৃত বস্তুসমূহে এর মাত্রা ছয়শ' । (৩) বিপদাপদে সবর করা। এর জন্য সওয়াব রয়েছে নয়শ'। এই ধরনের সবর যদিও

মোস্তাহাব, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার সবরের চেয়ে উত্তম যদিও তা ফরয। কেননা, হারাম বিষয়ে প্রত্যেক ঈমানদার ব্যক্তি সবর করতে পারে। কিন্তু বিপদে সবর সেই করবে, যার সিদ্দীকগণের মর্তবা অর্জিত হবে। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ) দোয়া করতেন ঃ

أَسْأَلُكَ مِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ عَلَيَّ بِهِ مَصَائِبَ الدُّنْيَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি এমন বিশ্বাস চাই, যা দ্বারা দুনিয়ার বিপদাপদ আমার জন্যে সহজ হয়ে যায়।

হযরত সোলায়মান বলেন ঃ আল্লাহর কসম, আমরা প্রিয় বস্তুতে সবর করতে না পারলে অপ্রিয় বস্তুতে কিরূপে সবর করতে পারব? এক হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ বলেন ঃ যখন আমি বান্দার দেহ, ধন-সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততির উপর মুসীবত প্রেরণ করি এবং সে তা উত্তম সবর দ্বারা বরদাশত করে নেয়, তখন কিয়ামতে তার জন্যে দাঁড়িপাল্লা নিযুক্ত করতে অথবা আমলনামা খুলে দিতে আমি লজ্জাবোধ করি। হাদীসে আছে—

انْتِظَارُ الْفَرَجِ بِالصَّبْرِ عِبَادَةٌ

অর্থাৎ, সবর সহকারে স্বাচ্ছন্দ্যের অপেক্ষা করা এবাদত।

অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে—বান্দার উপর যখন মুসীবত আসে এবং সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন" বলে এরপর বলে—

اللَّهُمَّ أْجُرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَعْقِبْنِي خَيْرًا مِنْهَا

অর্থাৎ, হে আল্লাহ মুসীবতে আমাকে পুরস্কৃত কর এবং এর পেছনে উত্তম বস্তু দান কর,

তখন আল্লাহ তা'আলা তাই করেন।

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন ঃ আমাকে রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন—আল্লাহ তা'আলা হযরত জিবরাঈলকে বললেন, হে জিবরাঈল, আমি যার উভয় চক্ষু নিয়ে নেই, তার প্রতিদান কি? জিবরাঈল বললেন ঃ আপনি আমাদেরকে যে বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন, তা ছাড়া আমরা

কিছুই জানি না। এরশাদ হল, তার প্রতিদান এই যে, সে সর্বদা আমার গৃহে থাকবে এবং আমার দীদার লাভ করে ধন্য হবে।

এক হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত আছে—আল্লাহ্ বলেন ঃ যখন আমি কোন বান্দাকে বিপদে ফেলি এবং সে সবর করে এবং যারা তার খবর নিতে আসে, তাদের কাছে কোন অভিযোগ করে না, আমি তার মাংসের চেয়ে প্রতিদানে উত্তম মাংস দেই এবং তাকে তার রক্তের চেয়ে উত্তম রক্ত দান করি। যখন তাকে রোগমুক্তি দান করি, তখন তার কোন গোনাহ্ থাকে না, আর যখন মৃত্যু দেই, তখন আমার রহমতের ছায়াতলে নিয়ে আসি।

হযরত দাঊদ (আঃ) আল্লাহর দরবারে আরয করলেন ঃ ইলাহী! যে দুঃখী ব্যক্তি তোমার সন্তুষ্টির আশায় বিপদে সবর করে, তার প্রতিদান কি? এরশাদ হল ঃ তার প্রতিদান এই যে, তাকে ঈমানের পোশাক পরিয়ে কখনও তা খুলব না। হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ) একবার খোতবায় বললেন ঃ আল্লাহ্ যখন কোন বান্দাকে নেয়ামত দেন এবং পরে তা নিয়ে যান, তখন যদি সে সবর করে, তবে এর বিনিময়ে আল্লাহ্ এমন নেয়ামত দান করেন, যা পূর্বের নেয়ামতের চেয়ে উত্তম হয়ে থাকে। এরপর তিনি এই আয়াত পাঠ করলেন ঃ

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারীরাই তাদের পুরস্কার বেহিসাব পায়।

বর্ণিত আছে, হযরত শিবলী (রহঃ) জেলে আবদ্ধ হলে কিছু লোক তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমরা কারা? লোকেরা বলল ঃ আমরা আপনার সুহৃদ। আপনাকে দেখতে এসেছি। তিনি তাদের প্রতি ঢিল ছুঁড়তে লাগলেন। ফলে, তারা সকলেই পালিয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন ঃ যদি তোমরা আমার সুহৃদ হতে, তবে আমার বিপদে সবর করতে। জনৈক সাধু ব্যক্তির পকেটে একটি কাগজের টকুরা ছিল। তিনি কিছুক্ষণ পরপর সেটি বের করে দেখে নিতেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

অর্থাৎ, তুমি তোমার পালনকর্তার নির্দেশের জন্যে সবর কর। তুমি আমার দৃষ্টির সামনেই রয়েছ।

বর্ণিত আছে, ফাতাহ মুসেলীর পত্নী একবার পা পিছলে পড়ে যান। এতে তার নখ উঠে যায়। তিনি হেসে উঠলেন। লোকেরা জিজ্ঞাসা করল ঃ আপনার কষ্ট হচ্ছে না? তিনি বললেন ঃ এর সওয়াবের আনন্দে ব্যথার তিক্ততা অনুভব করতে পারছি না।

হযরত দাঊদ (আঃ) তাঁর পুত্র সোলায়মান (আঃ)-কে বললেন ঃ তিনটি বিষয় দ্বারা মুমিনের তাকওয়া প্রমাণিত হয়—(১) সে যা পায় না, তাতে উত্তম তাওয়াক্কুল করা, (২) যা পায়, তাতে উত্তমরূপে সন্তুষ্ট থাকা এবং (৩) যে বস্তু পাওয়ার পর হাতছাড়া হয়ে যায়, তাতে উত্তম সবর করা। রসূলে আকরাম (সাঃ) এরশাদ করেন—

مِنْ إِجْلَالِ اللّٰهِ وَمَعْرِفَةِ حَقِّهِ أَنْ لَا تَشْكُوا وَجَعَكَ وَلَا تَذْكُرَ مُصِيبَتَكَ

অর্থাৎ,তুমি তোমার ব্যথার অভিযোগ করবে না এবং বিপদাপদের আলোচনা করবে না—এটাই আল্লাহর সম্মান ও তাঁর হকের পরিচয়।

উপরে যা বর্ণিত হল, তা হচ্ছে আল্লাহর পথের পথিকগণের সবর।

এখন প্রশ্ন হয় যে, বিপদাপদে মানুষ সবরের মর্তবা কিরূপে লাভ করবে? কারণ, এটা এখতিয়ারাধীন ব্যাপার নয়। অন্তরে বিপদাপদের প্রতি অশ্রদ্ধা না থাকার নাম যদি সবর হয়, তবে এটা মানুষের এখতিয়ারের অন্তর্ভুক্ত নয়। জওয়াব এই যে, সবরকারীর তালিকা থেকে মানুষ তখনই বাদ পড়বে, যখন সে বিপদে হা-হুতাশ করবে, মুখমন্ডলে আঘাত করবে এবং পরিধানের জামা ছিঁড়ে ফেলবে। এছাড়া উঠতে-বসতে অভিযোগ করবে, দুঃখ প্রকাশ করবে এবং খাওয়া-পরার অভ্যাস পাল্টে দেবে। এসব কাজ মানুষের এখতিয়ারাধীন। সবর করার জন্যে এসব বিষয় থেকে আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব। এছাড়া আল্লাহর বিধানে সন্তুষ্টি ছাড়া মুখে অন্য কিছু প্রকাশ করবে না এবং খাওয়া-পরার অভ্যাসে কোন পরিবর্তন করবে

না। মনে করতে হবে, হারানো বস্তুটি তার কাছে আমানত ছিল, যা মালিক ফেরত নিয়ে গেছেন।

রমিছা উম্মে সুলায়মান বর্ণনা করেন ঃ আমার অসুস্থ শিশুপুত্র যখন মারা গেল, তখন আমার স্বামী হযরত আবু তালহা (রাঃ) বাড়ী ছিলেন না। আমি ঘরের এক কোণে মৃতদেহ রেখে কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখলাম। এরপর আবু তালহা বাড়ী ফিরলে আমি যথারীতি তার সামনে খাবার পেশ করলাম। তিনি খেতে খেতে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ছেলের অবস্থা কেমন? আমি বললাম ঃ আলহামদু লিল্লাহ, ভাল। এরূপ বলার কারণ এই যে, অসুস্থ হওয়ার পর থেকে কোন রাত্রি এত শান্তিতে কাটেনি, যেমন সেই রাত্রিটি কেটেছিল। এরপর আমি অন্য দিনের তুলনায় অধিক সাজসজ্জা করলাম এবং আমার স্বামী আমার সাথে সহবাস করলেন। অতঃপর আমি তাকে বললাম ঃ আমাদের প্রতিবেশীর কাণ্ড দেখ, সে একটি বস্তু চেয়ে এনেছিল। এখন মালিক সেটি ফেরত নিয়ে গেলে সে হৈচৈ শুরু করে দিল। আবু তালহা বললেন ঃ প্রতিবেশী এরূপ করে থাকলে খুবই খারাপ করেছে। আমি বললাম ঃ তোমার পুত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে ধার ছিল। আল্লাহ এখন তা নিয়ে গেছেন। একথা শুনে আবু তালহা আল্লাহর শোকর আদায় করলেন এবং "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" পাঠ করলেন। পরের দিন সকালে তিনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর খেদমতে হাযির হয়ে ঘটনা বর্ণনা করলেন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ ইলাহী! এই রাত্রির ব্যাপারে বরকত দাও। বর্ণনাকারী বলেন ঃ এই দোয়ার পর আমি মসজিদে আবু তালহার সাতটি পুত্র সন্তানকে কোরআন পাঠ করতে দেখেছি।

হযরত জাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন, আমি স্বপ্নে বেহেশতে প্রবেশ করেছি এবং আবু তালহার পত্নী রমিছাকে সেখানে দেখেছি। জনৈক বুযুর্গ বলেন ঃ "সবরে জমীল" (সুন্দর সবর) হচ্ছে, বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে অন্যদের থেকে পৃথকভাবে চিনতে না পারা। মৃতের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করলে কেউ সবরকারীদের তালিকা থেকে খারিজ হয়ে যায় না। কেননা, এটা মানবতার অন্যতম দাবী। মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ এ থেকে বাঁচতে পারে না। এ কারণেই রসূলে করীম (সাঃ)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইবরাহীমের ইন্তেকালে তাঁর চোখ থেকে অশ্রু প্রবাহিত হতে

থাকে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ আপনি তো আমাদেরকে এরূপ করতে বারণ করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ

إِنَّ هٰذِهٖ رَحْمَةٌ وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ

অর্থাৎ, এটা করুণা। যারা করুণা করে, তারাই আল্লাহ তা'আলার করুণা পায়।

হাঁ, পূর্ণাঙ্গ সবর হচ্ছে রোগ, দারিদ্র্য ও সকল বিপদাপদকে গোপন রাখা।

সবর লাভ করার উপায় ঃ প্রকাশ থাকে যে, যিনি রোগ-ব্যাধি প্রেরণ করেছেন, তিনি এর ঔষধও নাযিল করেছেন এবং আরোগ্য দানের ওয়াদা করেছেন। সুতরাং সবর যদিও অত্যন্ত কঠিন ও দুরূহ ব্যাপার; কিন্তু এলম ও আমলের মাধ্যমে তা লাভ করা সম্ভব। সবরের প্রকার বিভিন্ন বিধায় তার প্রতিবন্ধকও বিভিন্ন এবং চিকিৎসা পদ্ধতিও বিভিন্নরূপ। বিষয়টি দীর্ঘ বর্ণনার দাবী রাখে। কিন্তু নিম্নে আমরা কতিপয় দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এর চিকিৎসা পদ্ধতি বলে দিচ্ছি।

উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি যিনার কামভাব থেকে সবর অর্জন করতে চায়। এই কামভাব তার উপর এত প্রবল যে, সে যৌন অঙ্গকে বিরত রাখতে সক্ষম হলেও দৃষ্টিকে বিরত রাখতে সক্ষম নয়। কিংবা এতে সক্ষম হলেও মনকে বশ করতে পারে না। মন সব সময় তাকে কামভাবে জড়িয়ে রাখে। এ জন্যে অব্যাহতভাবে যিকর, এবাদত ও সৎকর্ম সম্পাদন তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এখন এর প্রতিকার শুনুন ঃ

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, ধর্মীয় প্রেরণা এবং শয়তানী প্রেরণার মধ্যে সংঘর্ষ হতে থাকে। আমরা যদি এদের এক পক্ষের বিজয় এবং অপরপক্ষের পরাজয় কামনা করি, তবে যাকে বিজয়ী করা উদ্দেশ্য হয়, তাকে শক্তি যোগানো এবং অপরের উপর চাপ সৃষ্টি করা উচিত। সেমতে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে ধার্মিক প্রেরণাকে শক্তি যোগানো এবং তার প্রতিপক্ষকে দুর্বল করা জরুরী। কামপ্রেরণাকে দুর্বল করার উপায় তিনটি। প্রথমত, কামপ্রেরণার আসল উৎসকে দেখতে হবে, সে কোথা থেকে শক্তি সঞ্চয় করে। এতে জানা যাবে, তার শক্তির আসল উৎস হচ্ছে উৎকৃষ্ট ও পর্যাপ্ত

খাদ্য গ্রহণ। সুতরাং খাদ্য নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সর্বদা রোযা রাখতে হবে। সে কেবল ইফতারের সময় সামান্য লঘু খাদ্য গ্রহণ করবে। মাংস ইত্যাদি কামোত্তেজক খাদ্য সামগ্রী বর্জন করবে।

দ্বিতীয়ত, কামভাবের সামগ্রী মওজুদ থাকলে তা দূর করতে হবে। কামোত্তেজনার মূল কারণ হচ্ছে দৃষ্টি। এ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে নির্জনবাস অবলম্বন করা জরুরী। হাদীসে আছে –

اَلنَّظْرُ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ اِبْلِيْسَ

অর্থাৎ, দৃষ্টি ইবলীসের অন্যতম তীর।

সে এই তীর এমনভাবে নিক্ষেপ করে যে, চক্ষু বন্ধ রাখা ছাড়া একে প্রতিহত করার অন্য কোন ঢাল নেই। সুতরাং মানুষ যখন রূপসীদের আনাগোনার স্থান থেকে অন্যত্র সরে যাবে, তখন ইবলীসের এই তীর তার গায়ে লাগবে না।

তৃতীয়ত মানুষ যে বস্তুর খাহেশ করে, সে জাতীয় বৈধ বস্তুর দ্বারাই মনকে সান্ত্বনা দিতে হবে। উদাহরণতঃ বর্ণিত দৃষ্টান্তে বিবাহ দ্বারা মনকে সান্ত্বনা দেবে। কেননা, তার মন যা চায়, বিবাহিতা স্ত্রীর মধ্যে তা বিদ্যমান রয়েছে। অতএব, নিষিদ্ধ পাত্রে যাওয়ার প্রয়োজন কি? অধিকাংশ লোকের জন্যে এই চিকিৎসা উপকারী। তবে কিছু সংখ্যক মানুষের কামভাব এতে প্রশমিত হয় না।

এখানে প্রথমোক্ত চিকিৎসাটি (খাদ্য মওকুফ করা) হচ্ছে, যেমন অবাধ্য জন্তু অথবা পাগলা কুকুরকে খাদ্য না দেয়া, যাতে তার শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুকুরের সম্মুখ থেকে মাংস লুকিয়ে ফেলা, যাতে না দেখে এবং খাহেশ না করে। তৃতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, কুকুরের পছন্দনীয় খাদ্যের মধ্য থেকে সামান্য তাকে দেয়া, যাতে শাসনে সবর করার মত শক্তি তার মধ্যে অবশিষ্ট থাকে।

অপরপক্ষে ধর্মীয় প্রেরণাকে দু'ভাবে শক্তি যোগানো যায়। প্রথমত মনকে সাধনার উপকারিতা এবং দ্বীন ও দুনিয়াতে তার শুভ ফলাফলেরও লোভ দেখানো। এ উদ্দেশ্যে সবরের ফযীলত এবং ইহকাল ও পরকালে তার শুভ পরিণতি সম্পর্কে যে সকল হাদীস ও রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে,

সেগুলোতে অধিক পরিমাণে চিন্তাভাবনা করা দরকার। এর ফলে ধর্মীয় প্রেরণা শক্তিশালী হয় এবং তাতে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, ধর্মীয় প্রেরণার মধ্যে শয়তানী প্রেরণাকে ভূলুণ্ঠিত করার অভ্যাস ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলা। কেননা, অভ্যাস ও দক্ষতা আমলের শক্তিকে মযবুত করে দেয়। এ কারণেই যারা পরিশ্রমের কাজ করে, যেমন কৃষক ও সিপাহী, তারা আতর বিক্রেতা, ফেকাহবিদ ও সাধু ব্যক্তিদের তুলনায় অধিক শক্তিধর হয়ে থাকে। কারণ, শেষোক্ত ব্যক্তিদের শক্তি অভ্যাস ও দক্ষতা দ্বারা মযবুত হয় না।

এ দুটি চিকিৎসার মধ্যে প্রথম চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কুস্তিগীরকে ওয়াদা দেয়া যে, যদি প্রতিপক্ষকে ভূমিসাৎ করে দাও, তবে অনেক পুরস্কার পাবে। উদাহরণতঃ ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবিলায় জাদুকরদেরকে বলেছিল ঃ তোমরা জয়ী হলে আমি তোমাদেরকে নৈকট্যশালী করে নেব। দ্বিতীয় চিকিৎসা হচ্ছে, যেমন কোন বালককে কুস্তি শেখানোর উদ্দেশ্য হলে শৈশব থেকেই তাকে এ শাস্ত্রের জরুরী বিষয়াদিতে অভ্যস্ত করে তোলা হয়, যাতে কুস্তির প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে এবং শক্তি ও সাহসিকতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। সুতরাং যে ব্যক্তি সবর সহকারে সাধনাই পরিত্যাগ করবে, তার মধ্যে ধর্মীয় প্রেরণা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সে কামভাবে প্রবল হতে পারবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নিজেকে খাহেশের খেলাফ কাজে অভ্যস্ত করবে, সে যখন ইচ্ছা কামভাবের উপর জয়ী হতে পারবে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি সবরের সকল ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শোকর

জানা উচিত যে, আল্লাহ তা'আলা কোরআন পাকে শোকরকে যিকরের সাথে উল্লেখ করেছেন। অথচ তিনি একথাও বলেছেন যে,

ولذكر الله اكبر অর্থাৎ, আল্লাহর যিকর অত্যন্ত মহান।

এরশাদ হয়েছে—

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদেরকে স্মরণ করব। তোমরা আমার অনুগ্রহ স্বীকার কর— নাশোকরী করো না।

এমন মহান বস্তুর সাথে শোকরের উল্লেখ এর পরিপূর্ণ শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করে। আল্লাহ আরও বলেন ঃ

مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ

অর্থাৎ, তোমরা যদি অনুগ্রহ স্বীকার কর এবং ঈমান রাখ, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে আযাব দিয়ে কি করবেন?

এক আয়াতে আছে—

وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ অর্থাৎ, আমি শোকরকারীদেরকে প্রতিদান দেব।

আল্লাহ তা'আলা অভিশপ্ত ইবলীসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

অর্থাৎ, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্যে তোমার সরল পথে বসে থাকব।

কোন কোন তাফসীরকারের মতে এখানে সরল পথের অর্থ শোকরকারীদের পথ।

শোকর উচ্চ মর্তবার অধিকারী বিধায় অভিশপ্ত ইবলীস মানুষের শোকর না করার দোষটিই উল্লেখ করে বলেছে—

وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ অর্থাৎ, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকরকারী পাবে না।

আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন—

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ অর্থাৎ, আমার কম বান্দাই শোকরকারী।

তিনি শোকরের সাথে নেয়ামত বৃদ্ধি করার বিষয়টি নিশ্চিতরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এতে কোন ব্যতিক্রম বর্ণনা করেননি। যেমন এরশাদ হয়েছে—

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ অর্থাৎ, তোমরা শোকর করলে আমি অবশ্যই নেয়ামত বৃদ্ধি করব।

অথচ অন্য পাঁচটি নেয়ামত অর্থাৎ, ধনাঢ্য করা, দোয়া কবুল করা, রূযী দেয়া, ক্ষমা করা এবং তওবা কবুল করার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম উল্লেখ করেছেন। এরশাদ হয়েছে فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভবিষ্যতে নিজ কৃপায় তোমাদেরকে ধনাঢ্য করবেন।

فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ অর্থাৎ, অতঃপর যদি ইচ্ছা করেন, তিনি উন্মুক্ত করে দেন যার জন্যে তোমরা দোয়া কর।

يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা

বেহিসাব রিযক দান করেন। وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি শিরক ব্যতীত অন্য গোনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।

وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ অর্থাৎ, তিনি যাকে ইচ্ছা তওবা দেন।

এ থেকে জানা যায় যে, শোকর একটি অত্যুৎকৃষ্ট বিষয়। আল্লাহ এতে নিজের ইচ্ছার শর্ত আরোপ করেননি। বরং নেয়ামত বৃদ্ধির অকাট্য ওয়াদা করেছেন।

এছাড়া জান্নাতবাসীদের প্রথম বাক্যও শোকরই হবে। আল্লাহ বলেন ঃ

وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ অর্থাৎ, জান্নাতীরা বলবে, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন।

وَاٰخِرُ دَعْوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ অর্থাৎ, তাদের শেষ দোয়া হবে— সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি বিশ্বের পালনকর্তা।

হাদীসেও শোকরের অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এক হাদীসে রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

اَلطَّاعِمُ الشَّاكِرُ بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ অর্থাৎ, যে খায় ও শোকর করে, সে সবরকারী রোযাদারের অনুরূপ।

হযরত আতা (রঃ) বর্ণনা করেন— আমি একবার হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়ে আরয করলাম ঃ আপনি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সর্বাধিক আশ্চর্যজনক যে অবস্থাটি স্বচক্ষে দেখেছেন, তা আমার কাছে বর্ণনা করুন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন ঃ তাঁর কোন্ অবস্থাটি আশ্চর্যজনক ছিল না? এক রাতে তিনি আমার কাছে এলেন এবং বিছানায় অথবা লেপের নিচে আমার সাথে শয়ন করলেন। এক সময় তাঁর দেহ

আমার দেহকে স্পর্শ করল। তিনি বলে উঠলেন ঃ হে আবু বকর-তনয়া! পরওয়ারদেগারের এবাদতের জন্যে আমাকে ছেড়ে দাও। আমি আরয করলাম ঃ আমি তো আপনার সাথেই থাকতে চাই। তবে আমি আপনার মরযীর অনুগামী। আমি অনুমতি দিয়ে দিলাম। তিনি গাত্রোত্থান করলেন এবং পানির জালার কাছে চলে গেলেন। সেখানে অল্প পানিতে উযু করলেন। অতঃপর দাঁড়িয়ে নামায পড়তে লাগলেন এবং অনবরত অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। অশ্রু তাঁর বুকে প্রবাহিত হতে লাগল। এরপর রুকুতে, সেজদায় এবং উভয় সেজদার মাঝখানে অশ্রু বিসর্জন করলেন। তিনি এমনিভাবে কাঁদতে লাগলেন। অবশেষে বেলাল এসে তাঁকে ফজরের নামাযের কথা জানালেন। আমি আরয করলাম ঃ ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ তা'আলা আপনার অগ্র-পশ্চাৎ সকল গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন। এমতাবস্থায় আপনার ক্রন্দনের কারণ কি? তিনি এরশাদ করলেন ঃ আমি কি আল্লাহর শোকরগোযার বান্দা হব না? আমি কাঁদব না কেন যেখানে আল্লাহ আমার প্রতি এই আয়াত নাযিল করেছেন ঃ

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ الْاٰيَةَ

অর্থাৎ, এ থেকে জানা যায়, ক্রন্দন কখনও সমাপ্ত না হওয়া উচিত। এ রহস্যের প্রতিই নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতে ইঙ্গিত রয়েছে ঃ একবার জনৈক পয়গম্বর পথ চলার সময় পথিমধ্যে একটি ছোট পাথর দেখতে পান। পাথরটি থেকে অনেক পানি বের হতে দেখে তিনি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যান। আল্লাহ তা'আলা পাথরকে বাকশক্তি দান করলেন। সে আরয করল— যেদিন থেকে আমি আল্লাহর উক্তি শুনেছি যে, জাহান্নামের ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, সেদিন থেকেই আমি ভয়ে কাঁদছি। পয়গম্বর তৎক্ষণাৎ আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন— ইলাহী! এই পাথরকে তুমি আগুন থেকে রক্ষা কর। তাঁর দোয়া কবুল হল। তিনি পাথরকে একথা জানিয়ে চলে গেলেন। দীর্ঘদিন পর তিনি সে পথে এসে পাথরকে পূর্ববৎ কাঁদতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ আবার কাঁদছ কেন? সে আরয করল ঃ পূর্বের কান্নার কারণ ছিল ভয়। আর এখন কাঁদছি শোকর ও আনন্দে।

বলা বাহুল্য, মানুষের অন্তরও পাথরের মত অথবা পাথরের চেয়েও শক্ত। তাই এর কঠোরতা ভয় ও শোকর অবস্থায় কান্না ছাড়া দূর হবে না। এক হাদীসে বলা হয়েছে—কিয়ামতের দিন ডাক দেয়া হবে—যারা আল্লাহ তা'আলার অধিক হামদ করে, তারা উঠ। এরপর একটি দল উঠে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন ঃ অধিক হামদকারী কারা? উত্তর হল—যারা সর্বাবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। আরেক রেওয়ায়েতে আছে, যারা সুখে ও কষ্টে আল্লাহর শোকর করে।

শোকরের সংজ্ঞা ও স্বরূপ ঃ যে আল্লাহর পথে চলে, তার মনযিলসমূহের মধ্যে একটির নাম শোকর। এই শোকর তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত- এলম, হাল ও আমল। এলম থেকে হাল এবং হাল থেকে আমল সৃষ্টি হয়। এলম হচ্ছে সকল নেয়ামতকে আল্লাহর পক্ষ থেকে জানা। হাল হচ্ছে আল্লাহর নেয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়া এবং আমলের অর্থ যা আল্লাহর উদ্দেশ্য ও প্রিয়, তাতে কায়েম থাকা। আমল অন্তর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং জিহ্বার সাথেও সম্পৃক্ত। শোকরের স্বরূপ পূর্ণরূপে জানার জন্যে সবগুলো বর্ণনা করা জরুরী।

শোকরের সংজ্ঞা সম্পর্কে অনেক উক্তি বর্ণিত রয়েছে। কিন্তু তার কোনটির মধ্যে শোকরের পূর্ণ অর্থ নেই। এলম সম্পর্কে বলতে গেলে তিনটি বিষয় জানা দরকার। এক, স্বয়ং নেয়ামতকে জানতে হবে। দুই, এই নেয়ামত যে তার জন্যে নেয়ামত, তা জানতে হবে। তিন, নেয়ামতদাতার সত্তা ও সিফাতসমূহ জানা দরকার। এটা আল্লাহ ছাড়া শুধু অন্যের বেলায়। আল্লাহর বেলায় এই এলম দরকার যে, সকল নেয়ামত আল্লাহর পক্ষ থেকেই। তিনিই প্রকৃত নেয়ামতদাতা। মধ্যবর্তী সকলেই তাঁর পক্ষ থেকে কর্মী মাত্র, যারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য। এখন জানা উচিত যে, এই এলম তখন পূর্ণ হবে, যখন ক্রিয়াকর্মে শিরক না থাকে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তিকে কোন বাদশাহ কোন নেয়ামত দান করল। এই নেয়ামত পাওয়া অথবা তার হাতে পৌঁছার ব্যাপারে সে যদি বাদশাহের উকিল অথবা উযীরেরও দখল আছে বলে বিশ্বাস করে, তবে সে এই নেয়ামতে বাদশাহের সাথে অপরকেও শরীক করল এবং এই নেয়ামত যে সর্বতোভাবে বাদশাহের তরফ থেকে প্রদত্ত, তা মানল না; বরং কিছু বাদশাহের পক্ষ থেকে এবং কিছু উযীরের পক্ষ থেকে মনে করল। ফলে,

তার খুশীও উভয়ের মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে। অবশ্য যদি সে বিশ্বাস করে, যে নেয়ামত সে পেয়েছে, তা বাদশাহের ফরমানের কারণে, যা তিনি নিজের কলম দ্বারা কাগজে লিখেছেন, তবে এতে শিরক হবে না এবং পূর্ণ শোকরে ত্রুটি থাকবে না। কেননা, সে কলম ও কাগজের তো শোকর করে না। এমনিভাবে যদি সে বাদশাহের উযীরকেও মনে করে যে, সে বাদশাহের চাপ ও আদেশের কারণে দেয়— নিজের ক্ষমতা থাকলে কিছুই দিত না, তবে এতে শিরক হবে না। এখানে উযীর কাগজ ও কলমের মতই গণ্য হবে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলাকে জানবে এবং তাঁর কর্মকে চিনবে, সে জানতে পারবে, সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্র সবই তাঁর আদেশের অনুসারী। সুতরাং আল্লাহর নেয়ামত যদি কারও কাছে অন্যের হাতে পৌঁছে, তবে বুঝতে হবে, সে তা পৌঁছাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বাধ্য ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তার মনে এই বিশ্বাস সৃষ্টি করেছেন যে, এই নেয়ামতটি অমুকের কাছে পৌঁছানোর মধ্যেই তার ইহকাল ও পরকালের কল্যাণ নিহিত। এরপর তার এ কাজটি না করার কোন কারণ থাকে না।

জানা গেল যে, আল্লাহ্ তা'আলাই প্রকৃত নেয়ামতদাতা। এ বিষয়টি জেনে নেয়ার পর নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি এককভাবে আল্লাহ্ তা'আলারই শোকর করতে সক্ষম হবে! বরং শুধু এই জানার কারণেই সে শোকরকারী হয়ে যাবে। সেমতে হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মোনাজাতে আল্লাহর দরবারে আরয করেন—ইলাহী! তুমি আদমকে স্বহস্তে সৃষ্টি করে কত নেয়ামত দান করেছ। সে তোমার শোকর কিভাবে আদায় করল? এরশাদ হল ঃ আদম এ সকল নেয়ামতকে আমারই পক্ষ থেকে বিশ্বাস করেছে। এ বিশ্বাসই ছিল তার শোকরগোযারী। অতএব বাহ্যিক নেয়ামতদাতাকে নিয়ে মেতে থাকা মানুষের উচিত নয়; বরং প্রকৃত নেয়ামতদাতারও ধ্যান করা উচিত। নতুবা এলমের ত্রুটির কারণে হালও ত্রুটিযুক্ত হবে এবং হাল ত্রুটিযুক্ত হওয়ার কারণে আমলও ত্রুটিযুক্ত থেকে যাবে।

দ্বিতীয় বিষয় হলো, যা এলম থেকে অর্জিত হয়। এর অর্থ নেয়ামতদাতার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া এবং তাঁর প্রতি বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করা। এলমের ন্যায় এটাও স্বতন্ত্র শোকর। এই শোকর তখনই হয়, যখন

তার শর্ত যথাযথভাবে পালিত হয়। শর্ত এই যে, সন্তুষ্ট কেবল নেয়ামতদাতার প্রতি হতে হবে— নেয়ামত ও নেয়ামত দানের প্রতি নয়। সম্ভবত এ বিষয়টি কারও হৃদয়ঙ্গম হবে না। তাই একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পাচ্ছি।

উদাহরণতঃ জনৈক বাদশাহ্ সফরে বের হওয়ার পূর্বক্ষণে এক ব্যক্তিকে একটি ঘোড়া দান করল। সে ব্যক্তি এই ঘোড়া পাওয়ায় তিন প্রকারে সন্তুষ্ট হতে পারে। প্রথমত, কেবল ঘোড়ার প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া যে, এটা উপকারী সম্পদ, সওয়ারীর যোগ্য, উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক এবং উৎকৃষ্ট বংশোদ্ভূত। এ ধরনের সন্তুষ্ট সেই হবে, যার বাদশাহের প্রতি কোন কৌতূহল নেই— কেবল ঘোড়ার প্রতিই কৌতূহল। এমনকি, যদি সে এই ঘোড়া জঙ্গলেও পেত, তবু এতটুকুই সন্তুষ্ট হত। দ্বিতীয়ত, কেবল বাদশাহের দানের কারণে সন্তুষ্ট হওয়া। কারণ, এতে বুঝা যায়, এই ব্যক্তির প্রতি বাদশাহের সুদৃষ্টি ও অনুগ্রহের মনোভাব রয়েছে। সে যদি এই ঘোড়াটি জঙ্গলে ঘুরাফেরা অবস্থায় পেয়ে যেত, তবে কখনও সন্তুষ্ট হত না। কারণ, এতে বাদশাহের অন্তরে আসন পাওয়ার উদ্দেশ্যটি হাসিল হত না। তৃতীয়ত, সন্তুষ্টির কারণ এই যে, সে সওয়ার হয়ে সফরের কষ্ট থেকে বেঁচে যাবে এবং বাদশাহের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর খেদমত করবে। এমনকি, বাদশাহের মন্ত্রী হয়ে যা য়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

উপরোক্ত তিন প্রকারের প্রথমটিতে শোকরের অর্থ পাওয়াই যায় না। কারণ, এতে দৃষ্টি কেবল ঘোড়ার প্রতি এবং সন্তুষ্টিও ঘোড়া পর্যন্তই সীমিত। দাতার প্রতি মোটেই ভ্রূক্ষেপ নেই। এটা সেসব লোকের অবস্থা, যারা কেবল নেয়ামতটি সুস্বাদু ও উদ্দেশ্য সাধনের সহায়ক হওয়ার কারণে সন্তুষ্ট হয়। তারা শোকরের স্তর থেকে বহুদূরে অবস্থান করে। দ্বিতীয় প্রকার শোকরের অর্থে অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু এতে নেয়ামতদাতার সত্তার দিক দিয়ে সন্তুষ্টি নেই; বরং একারণে যে, শাহী কৃপাদৃষ্টি নিশ্চিত হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও নেয়ামত লাভের কারণ হবে। এটা সেই সৎকর্মীদের অবস্থা, যারা শাস্তির ভয়ে ও সওয়াবের আশায় আল্লাহ তা'আলার শোকর ও এবাদত করে। তৃতীয় প্রকারে পূর্ণাঙ্গ শোকরের অর্থ পাওয়া যায়। এতে নেয়ামতে সন্তুষ্ট হওয়ার একমাত্র কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য ও দীদার

লাভ করে ধন্য হওয়া। এটা অত্যন্ত উচ্চ মর্তবা। এর পরিচয় এই যে, মানুষ আখেরাত অর্জনে সহায়ক বিষয়াদি ছাড়া অন্য কিছুতে সন্তুষ্ট হবে না এবং যে বিষয় আল্লাহকে ভুলিয়ে দেয় এবং তাঁর পথে অন্তরায় হয়, তাতে দুঃখিত ও বিষণ্ন হবে।

হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন ঃ শোকরের উদ্দেশ্য হচ্ছে নেয়ামতদাতা, আল্লাহর দীদার নয়। হযরত ইবরাহীম খাওয়াস (রাঃ) বলেন ঃ সাধারণ মানুষ পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ ইত্যাদিতে শোকর আদায় করে; কিন্তু বুযুর্গগণ অন্তরের হালে আল্লাহর শোকর আদায় করেন। এই মর্তবা এমন লোকদের বোধগম্য নয়, যারা আনন্দ ও খুশীকে কেবল উদরপূর্তি, যৌনতৃপ্তি, রঙ-তামাশা, সুর ইত্যাদিতে সীমিত মনে করে। কেউ এই মর্তবা লাভে অক্ষম হলে তার উচিত দ্বিতীয় মর্তবা লাভে সচেষ্ট হওয়া। প্রথম মর্তবা তো গণনার মধ্যেই পড়ে না।

তৃতীয় বিষয় আমল। অর্থাৎ, নেয়ামতদাতাকে জানার কারণে যে খুশী অর্জিত হয়, তদনুসারে কাজ করা। এই আমল অন্তর, জিহ্বা ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্পৃক্ত। অন্তরের আমল হচ্ছে কল্যাণকামিতা এবং সকল মানুষের জন্যে সৎ কামনা ও সদাচারের মনোভাব পোষণ করা। জিহ্বার আমল হচ্ছে শোকর জ্ঞাপন করে উৎকৃষ্ট প্রশংসাসূচক ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আমল হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে আল্লাহর নেয়ামত মনে করে তাঁর আনুগত্যে নিয়োজিত করা এবং এগুলোকে তাঁর নাফরমানীর কাজে সহায়ক না করা। উদাহরণতঃ চোখের আমল হল কোন মুসলমানের কোন দোষ দেখলে তা গোপন করা। কানের আমল কোন মুসলমানের কোন দোষ শ্রবণ করলে তা ফাঁস না করা। মুখের আমল, মুখে এমন ভাষা উচ্চারণ করা, যা দ্বারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। এমন করলে আল্লাহ তা'আলার এসব নেয়ামতের শোকর আদায় হয়। এরূপ করার নির্দেশও রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত আছে, রসূলে করীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আজ কেমন আছ? সে আরয করল ঃ ভাল। আল্লাহ তা'আলার সপ্রশংস শোকর করছি। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমার কাছে আমি একথাই আশা করছিলাম। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ পরস্পর যে কুশল বিনিময় করতেন, তার উদ্দেশ্যও এটাই ছিল যে, কোনরূপে মুখ দিয়ে আল্লাহর শোকর উচ্চারিত হোক।

মোটকথা, মুখে শোকর বলাও শোকরগোযারীর অন্তর্ভুক্ত। বর্ণিত আছে, কিছু লোক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (রহঃ)-এর খেদমতে উপস্থিত হয়। তাদের একজন যুবক কিছু আরয করার জন্যে দণ্ডায়মান হলে তিনি বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে অধিক বয়স্ক প্রথমে সে কথা বলবে। এরপর তার চেয়ে কম বয়স্ক ব্যক্তি বক্তব্য রাখবে। এমনিভাবে পর্যায়ক্রমে কথা বলা উচিত। যুবক আরয করল ঃ আমীরুল মুমিনীন! যদি সবকিছু বয়সের উপরই নির্ভরশীল হত, তবে মুসলমানদের শাসক এমন কোন ব্যক্তি হত, যে আপনার চেয়ে অধিক বয়স্ক। খলীফা বললেন ঃ আচ্ছা, যা বলতে চাও, বল। যুবক বলল ঃ আমরা আপনার কাছে চাইতে অথবা আপনার ভয়ে ভীত হয়ে এখানে আসিনি। কেননা, আপনার দানশীলতা আমরা ঘরে বসেই পেয়ে গেছি। সুতরাং চাওয়ার প্রয়োজন নেই। আর আপনার ন্যায়পরায়ণতাকে ভয় করারও কোন হেতু নেই। আমরা কেবল আপনার শোকর আদায় করতে এসেছি। মৌখিক শোকর আদায় করেই আমরা চলে যাব।

সারকথা, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ই শোকরের মূল। এগুলোর মাধ্যমে শোকরের স্বরূপ উদঘাটিত হয়। শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে কেউ কেউ বলেন ঃ

নেয়ামতদাতার নেয়ামত বিনীতভাবে স্বীকার করার নাম শোকর। এ সংজ্ঞায় মৌখিক উক্তি এবং অন্তরের কতক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন ঃ শোকর হচ্ছে অনুগ্রহকারীর অনুগ্রহ উল্লেখ করে তার প্রশংসা করা। এতে কেবল মৌখিক আমলের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হয়েছে। কারও কারও মতে শোকর হচ্ছে তত্ত্বে মগ্ন হওয়া এবং সদাসর্বদা নেয়ামতদাতার মহত্ত্ব স্মরণ রাখা। এই সংজ্ঞা শোকরের অধিকাংশ বিষয়কে শামিল করে; কিন্তু জিহ্বার আমল শোকরের বাইরে থেকে যায়।

হযরত জুনায়দ (রহঃ) শোকরের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেন ঃ শোকরকারী নিজেকে নেয়ামতের যোগ্য মনে করবে না। এতে কেবল অন্তরের একটি বিশেষ অবস্থা পাওয়া যায়। মনীষীগণের উল্লিখিত উক্তিসমূহ থেকে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। প্রত্যেকের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন ছিল বিধায় উক্তিও ভিন্ন ভিন্ন হয়েছে। বরং এক্ষেত্রে একই বুযুর্গের উক্তি দু'অবস্থার মধ্যে দু'রকম হয়েছে। কেননা, তাদের মধ্যে যখন যে হাল প্রবল হত, সে হাল অনুযায়ীই তারা বক্তব্য রাখতেন। তারা যতটুকু বলা প্রশ্নকারীর জন্যে উপযোগী মনে করতেন, ততটুকুই বলতেন, অপ্রয়োজনীয় কথা বলতেন না। এখানে পাঠকবর্গ যেন মনে না করেন যে, আমরা এসব কথা তাদের প্রতি বিদ্রূপ করে বলছি অথবা আমাদের সুচিন্তিত বক্তব্য তাদের মনঃপূত নয়। বরং কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আমাদের বক্তব্য অস্বীকার করতে পারবে না।

আল্লাহ্ তা'আলার ব্যাপারে শোকরের অর্থ ঃ কেউ মনে করতে পারে যে, শোকর এমন ক্ষেত্রে কল্পনা করা যায়, যেখানে নেয়ামতদাতা থাকে এবং শোকর দ্বারা তার কিছু না কিছু উপকার হয়। উদাহরণতঃ আমরা বাদশাহ্দের শোকর কয়েক প্রকারের করতে পারি এবং প্রত্যেক প্রকারের মধ্যে বাদশাহ্দের কিছু না কিছু স্বার্থ হাসিল হয়। প্রথমত, প্রশংসার মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতে বাদশাহ্দের উপকার এই যে, জনগণের মনে তাদের আসন মযবুত হয় এবং তাদের দানশীলতা সুখ্যাত হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, সেবা ও খেদমতের মাধ্যমে শোকর করতে পারি। এতেও তাদের কোন কোন উদ্দেশ্য হাসিলে সহায়তা হয়। তৃতীয়ত, চাকর-বাকরের আকৃতিতে বাদশাহদের সামনে দণ্ডায়মান হয়ে শোকর করতে পারি। এতে তাদের দল ও নামযশ বৃদ্ধি পায়।

মোটকথা, শোকরের কারণে নেয়ামতদাতার এ ধরনের কোন না কোন উপকার হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ক্ষেত্রে এরূপ হওয়া দু'কারণে অসম্ভব। প্রথম কারণ এই যে, আল্লাহ তা'আলা সকল স্বার্থ ও উদ্দেশ্য থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তাঁর সেবাযত্ন, সাহায্য, জাঁকজমক বৃদ্ধি এবং নওকর-চাকরের আধিক্যের প্রয়োজন নেই।

আমরা তাঁর সামনে রুকু-সেজদা করলে তাঁর কোন উপকার হয় না। সুতরাং তাঁর জন্যে শোকরও না থাকা উচিত। দ্বিতীয় কারণ এই যে, আমরা আপন এখতিয়ার দ্বারা যত কাজ করি, সেগুলোও আল্লাহ তা'আলার অন্যতম নেয়ামত। কেননা, আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, শক্তি-সামর্থ, ইচ্ছা-প্রয়াস এবং নড়াচড়ার উপকরণাদি সমস্তই আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টি।

সুতরাং তাঁর নেয়ামতের শোকর তাঁরই নেয়ামত দ্বারা কেমন করে হতে পারে? অতএব বুঝা গেল, উপরোক্ত দু'কারণে আল্লাহ তা'আলার জন্যে শোকর অসম্ভব। এখন এমন উপায় দরকার, যাতে এই অসম্ভাব্যতা না থাকে এবং শোকরও আদায় হয়।

এ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য এই যে, হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত মূসা (আঃ)-ও এমনি সমস্যার সম্মুখীন হয়ে আল্লাহর দরবারে আরয করেছিলেন ঃ ইলাহী! আমরা তোমার নেয়ামতের শোকর কিভাবে আদায় করব? কেননা, যখন শোকর করব, তখন তোমার কোন নেয়ামত দ্বারাই করব; অর্থাৎ, আমাদের শোকর তোমার অপর একটি নেয়ামত হবে, যার শোকর করা ওয়াজিব হবে। আল্লাহ তা'আলা জওয়াবে এই মর্মে ওহী পাঠালেন যে, তোমরা যখন এটা জেনে নিয়েছ, তখন আমিও ধরে নিলাম, আমার শোকর করেছ। এই ওহীর বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যা এলমে মোকাশাফার উপর নির্ভরশীল। তাই আমরা এ পর্যন্তই কলম গুটিয়ে নিচ্ছি এবং এলমে মোয়াসালায় বোধগম্য একটি বিষয় উল্লেখ করছি।

পয়গম্বরগণকে দুনিয়ায় প্রেরণ করার উদ্দেশ্য মানুষকে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করা। এই তাওহীদ পর্যন্ত পৌছার পথে রয়েছে অনেক দুরতিক্রম্য বাধা। শরীয়ত পুরাপুরিভাবে এসব বাধা অতিক্রম করার পন্থা বর্ণনা করে। এতে শোকর, শাকের ও যার শোকর করা হয়—পৃথক পৃথক মনে হয়। বিষয়টি একটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে বুঝা যাক। মনে কর, জনৈক বাদশাহ তাঁর কাছ থেকে দূরে অবস্থানকারী এক গোলামের কাছে সওয়ারী, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং পাথেয় হিসেবে নগদ টাকা-পয়সা প্রেরণ করল, যাতে সে পথের দূরত্ব অতিক্রম করে শাহী দরবারের নিকটে চলে আসে। এ নৈকট্যের সম্ভাব্য কারণ দুটি। (১) বাদশাহের উদ্দেশ্য দরবারে এসে গেলে কিছু কিছু শাহী দায়িত্ব পালন করবে। ফলে, রাজকার্যে সুবিধা হবে। (২) তার নিকটে আসার মধ্যে বাদশাহের কোন ফায়দা নেই এবং তাতে সাম্রাজ্যের কোন শ্রীবৃদ্ধিও হবে না। বরং এতে স্বয়ং গোলামের উপকার রয়েছে। সে বাদশাহের নৈকট্য লাভে ধন্য হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি বিধান ও তাঁর নৈকট্য লাভের ব্যাপারটিকেও এই দ্বিতীয় পর্যায়ে মনে করতে হবে। প্রথম পর্যায়ে গোলাম কেবল সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে

বাদশাহের কাছে চলে আসলেই শোকরকারী হবে না, যে পর্যন্ত বাদশাহের উদ্দিষ্ট রাজকার্যের দায়-দায়িত্ব পালন না করে। দ্বিতীয় পর্যায়ে যদিও কোন উপকার বাদশাহের কাম্য নয়, তবু গোলাম শাকের (শোকরকারী) ও কাফের (অস্বীকারকারী) হতে পারে। যদি সে বাদশাহের প্রদত্ত সামগ্রী যথাযথ খাতে ব্যয় করে, তবে সে শাকের হবে; অন্যথায় কাফের। সুতরাং সে যদি বাদশাহের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে, তবে সে প্রভুর শোকরকারী হবে। কেননা, প্রভুর নেয়ামতকে সে তারই অভীষ্ট কাজে ব্যয় করেছে। পক্ষান্তরে যদি গোলাম বাদশাহের সওয়ারীতে সওয়ার হয়ে বাদশাহের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে বিপরীত দিকে চলে এবং দূরে চলে যায়, তবে সে নেয়ামত অস্বীকারকারী হবে। আর যদি সওয়ার না হয় এবং নিকটে অথবা দূরে না যায়, তবু সে নেয়ামতের কাফের বলে গণ্য হবে। কেননা, সে প্রভুর নেয়ামতকে অকার্যকর করে রেখেছে। এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহর নিকটে থাকার মধ্যেই তার সৌভাগ্য নিহিত রেখেছেন। এরপর নৈকট্যের স্তর লাভের জন্যে এমন সব নেয়ামত সরবরাহ করেছেন, যেগুলো ব্যবহার করতে সে সক্ষম। কিন্তু মানুষ কামনা-বাসনার কারণে মহান দরবার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। মানুষের এই দূরত্ব ও নৈকট্যকে আল্লাহ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ۔

অর্থাৎ, আমি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করেছি। অতঃপর আমি তাকে হীনতম করে দেই; কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ণ। তাদের জন্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।

এ থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মাধ্যমে মানুষ হীনতম স্তর থেকে উন্নতি করে নৈকট্যের তথা সৌভাগ্যের স্তরে পৌঁছতে পারে। এতে উপকার মানুষেরই হবে। মানুষ নৈকট্যশীল হোক কিংবা দূরবর্তী, তাতে আল্লাহ তা'আলার কোন ফায়দা নেই।

এখন মানুষের ইচ্ছা। সে যদি নেয়ামতকে আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করে, তবে শোকরকারী হবে। কারণ, সে প্রভুর মরযী অনুযায়ী কাজ করেছে। আর যদি নাফরমানীতে ব্যবহার করে, তবে নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে প্রভুর মরযীর বিরুদ্ধে কাজ করেছে। আর যদি নেয়ামতকে অকার্যকর করে রাখে এবং আনুগত্য ও নাফরমানী কোন কিছুতে ব্যবহার না করে, তবে এতেও সে নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে। কারণ, সে নেয়ামতকে বিনষ্ট করে।

আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ প্রকাশ থাকে যে, আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানা ব্যতীত শোকর অর্জন ও নাশোকরী বর্জন পূর্ণ হতে পারে না। কেননা, শোকরের অর্থ হচ্ছে খোদায়ী নেয়ামতসমূহকে তাঁর পছন্দনীয় বিষয়ে ব্যবহার করা এবং নাশোকরীর মানে হচ্ছে নেয়ামতসমূহকে মোটেই ব্যবহার না করা অথবা অপছন্দনীয় বিষয়ে ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয় ও অপছন্দনীয় বিষয়সমূহ জানার উপায় দুটি। এক, কোরআনী আয়াত ও হাদীস শ্রবণ করা এবং দুই, অন্তর্দৃষ্টিতে দেখা। শেষোক্ত উপায়টি কঠিন বিধায় বিরল। আল্লাহ তাআলা রসূলগণকে প্রেরণ করে মানুষের জন্যে পথ সহজ করে দিয়েছেন। মানুষের ক্রিয়াকর্ম সম্পর্কিত শরীয়তের বিধি-বিধান জানার উপর এই পথের পরিচয় নির্ভরশীল। সুতরাং যে ব্যক্তি তার সকল ক্রিয়াকর্মে শরীয়তের বিধান সম্পর্কে অবগত হবে না, সে কখনও শোকরের দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

দ্বিতীয় উপায় অন্তর্দৃষ্টিতে দেখার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যে সকল সৃষ্টবস্তু দুনিয়াতে বিদ্যমান রয়েছে, সেগুলোর অন্তর্নিহিত রহস্য জানা। কেননা, দুনিয়াতে এমন কোন বস্তু নেই, যার মধ্যে কোন রহস্য নেই এবং সেই রহস্যের মধ্যে কোন উদ্দেশ্য নেই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক বস্তু দ্বারা যা উদ্দেশ্য, তাই আল্লাহ তা'আলার পছন্দনীয়। রহস্য দু'প্রকার—প্রকাশ্য ও গোপন। প্রকাশ্য ও বোধগম্য রহস্যসমূহ আল্লাহ তা'আলাও কোরআন মজীদে বর্ণনা করে দিয়েছেন, গোপন ও দুর্বোধ্য রহস্যসমূহ বর্ণনা করেননি। উদাহরণতঃ সূর্য সৃষ্টির মধ্যে এই রহস্য নিহিত যে, এর মাধ্যমে দিন ও রাত অস্তিত্ব লাভ করে। দিনের উদ্দেশ্য জীবিকা উপার্জন এবং রাত্রির

উদ্দেশ্য বিশ্রাম ও স্বস্তি অর্জন। এ হচ্ছে সূর্য সৃষ্টির প্রকাশ্য রহস্য। এ ছাড়া এর অনেক গোপন রহস্যও রয়েছে, যা বর্ণিত হয়নি। এমনিভাবে মেঘমালা ও বৃষ্টি বর্ষণের রহস্যও কোরআন পাকে উল্লিখিত হয়েছে। আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلٰى طَعَامِهِ إِنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُوْنًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ-

অর্থাৎ, মানুষ তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করুক। আমিই প্রচুর পানি বর্ষণ করি। অতঃপর আমি ভূমি বিদারিত করি এবং তাতে উৎপন্ন করি শস্য, আঙ্গুর, শাক-সবজি, যয়তুন, খেজুর, বহু বৃক্ষবিশিষ্ট বাগান, ফল এবং গবাদির খাদ্য। এটা তোমাদের এবং তোমাদের গৃহপালিত জন্তুদের ভোগের জন্যে।

নক্ষত্র ও তারকারাজির অন্তর্নিহিত রহস্য গোপন এবং সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। তারা যতটুকু জানে, তা এই যে, এগুলো আকাশের সাজসজ্জা, যা দেখে মানুষের চক্ষু পুলকিত হয়। নিম্নোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলাও এদিকে ইশারা করেছেন—

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِيْنَةِ الْكَوَاكِبِ

অর্থাৎ, আমি দুনিয়ার আকাশকে তারকারাজি দ্বারা সুশোভিত করেছি।

মোটকথা, আকাশ, নক্ষত্ররাজি, বায়ু, সমুদ্র, পাহাড়, জীবজন্তু ইত্যাদি জগতের প্রতিটি কণায় অসংখ্য রহস্য নিহিত। এক থেকে হাজার, দশ হাজার পর্যন্ত রহস্য প্রতিটি কণার ভেতরে পাওয়া যায়। প্রাণীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কিছু কিছু রহস্য সুবিদিত, যেমন সকলেই জানে যে, চক্ষু দেখার জন্যে—ধরার জন্যে নয়। হাত ধরার জন্যে—চলার জন্যে নয়। পা চলার জন্যে—ঘ্রাণ নেয়ার জন্যে নয়। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন অন্ত্র, পিত্ত, যকৃৎ, মূত্রাশয়, শিরা-উপশিরা ইত্যাদির রহস্য সবাই জানে না।

উপরোক্ত বক্তব্য থেকে জানা গেল, যে ব্যক্তি কোন নেয়ামতকে এমন কাজে ব্যবহার না করে, যার জন্যে সে নেয়ামত সৃজিত হয়েছে, সে সে নেয়ামতে আল্লাহ তা'আলার নাশোকরী করবে। উদাহরণতঃ এক ব্যক্তি হাত দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে প্রহার করল। এখানে প্রহারকারী হাতের নেয়ামতে নাশোকর হবে। কেননা, হাত সৃষ্টি হয়েছে ক্ষতিকর বস্তুকে নিজের কাছ থেকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে এবং উপকারী বস্তুকে গ্রহণ করার জন্যে। অপরকে প্রহার করার জন্যে নয়।

এখন আমরা গোপন রহস্যসমূহের একটি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করছি, যাতে মানুষ এর সাহায্যে অন্যান্য বিষয়েও শোকর ও নাশোকরী সম্পর্কে অবগত হতে পারে। আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা। এ দুটি বস্তুর উপরই বিশ্বের ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত। যদিও এগুলো পাথর মাত্র—পানাহার ও পরিধানের উপকারে আসে না, তথাপি এগুলোর প্রতি মানুষ চরম মাত্রায় মুখাপেক্ষী। কেননা, প্রত্যেক মানুষের অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থানের ক্ষেত্রে অনেক বস্তুর প্রয়োজন থাকে। এগুলো বিনিময় ছাড়া লাভ করার উপায় নেই। এই বিনিময়ের জন্যে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান হওয়া জরুরী। কেননা, এটা জানা কথা যে, কেউ বস্ত্রের বিনিময়ে গৃহ অথবা ঘোড়ার বিনিময়ে আটা অথবা মোজার বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করতে চাইলে তা পারবে না। কেননা, এখানে উভয় বস্তুর মূল্যমান সমান নয়। এই অসুবিধা দূর করার জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা সৃষ্টি করেছেন, যাতে এগুলোর দ্বারা প্রত্যেক বস্তুর মূল্যমান নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণতঃ বলা যায় যে, এই উট একশ' স্বর্ণমুদ্রার এবং এই পরিমাণ জাফরান একশ' স্বর্ণমুদ্রার। কাজেই উভয়টি সমান। অতএব বিনিময়যোগ্য। স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা দ্বারা সমকক্ষতা সম্ভব হওয়ার কারণ এই যে, এগুলোর সাথে অন্য কোন উদ্দেশ্যের সম্পর্ক নেই এবং এগুলোকে খাওয়াও হয় না, পানও করা হয় না। আল্লাহ তা'আলা এগুলোকে এক হাত থেকে অন্য হাতে যাওয়ার জন্যেই সৃষ্টি করেছেন এবং এতে এই রহস্যও নিহিত রেখেছেন যে, এগুলো দ্বারা সকল বস্তু লাভ করা যায়। সুতরাং এগুলোর মালিক হওয়া যাবতীয় বস্তুর মালিক হওয়ার নামান্তর। এছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার আরও অনেক রহস্য রয়েছে।

এখন যদি কেউ স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রাকে এমন কাজে ব্যবহার করে, যা এই রহস্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় কিংবা উদ্দেশ্যের বিপরীতে ব্যবহার করে, তবে সে এই নেয়ামতদ্বয়ে আল্লাহর নাশোকর হবে। উদাহরণতঃ কেউ এগুলোকে মাটিতে পুঁতে রাখলে সে এ উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে। সেমতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন ঃ

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ-

অর্থাৎ, যারা সোনা ও রূপা মাটিতে পুঁতে রাখে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা শুনিয়ে দিন।

আর যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্র নির্মাণ করায়, সে-ও নেয়ামতের অস্বীকারকারী হবে এবং তার এ কাজ পুঁতে রাখার চেয়েও অধিক নিন্দনীয়। রসূলে করীম (সাঃ) এরশাদ করেন ঃ

مَنْ شَرِبَ فِىْ اٰنِيَةٍ مِّنْ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ فَكَاَنَّمَا يَتَجَرَّعُ فِىْ بَطْنِهٖ نَارَجَهَنَّمَ-

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি স্বর্ণ অথবা রূপার গ্লাসে পানি পান করে, সে যেন তার পেটে গটগট করে জাহান্নামের আগুন ঢালে।

অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি সোনা-রূপার মাধ্যমে সুদের কারবার করবে, সেও নেয়ামতের অস্বীকারকারী ও যালেম হবে। কেননা, এ দুটি বস্তু অন্য বস্তু হাসিল করার উপায় হিসাবে সৃজিত হয়েছে—নিজের বিশেষ সত্তার দ্বারা উপকার দেয়ার জন্যে সৃজিত হয়নি। সুতরাং যে ব্যক্তি স্বয়ং এগুলোর মধ্যেই ব্যবসা করবে, সে রহস্যের বিপরীত কাজ করবে।

নেয়ামতের স্বরূপ ও প্রকারভেদ ঃ আল্লাহ তা'আলার নেয়ামতসমূহ গণনা করা মানুষের সাধ্যের বাইরে। আল্লাহ নিজেই বলেন ঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর নেয়ামতসমূহ গণনা করে শেষ করতে পারবে না।

আমরা এখানে প্রথমে কয়েকটি সামগ্রিক বিষয় উল্লেখ করব, যা নেয়ামতসমূহ চেনার মূলনীতি হিসাবে কাজ করবে। এরপর পৃথক পৃথক নেয়ামতসমূহ বর্ণনা করব।

প্রকাশ থাকে যে, প্রত্যেক কল্যাণ, আনন্দ, সৌভাগ্য বরং প্রত্যেক প্রার্থিত বিষয়কে নেয়ামত বলা যায়। কিন্তু বাস্তবে পারলৌকিক সৌভাগ্যের নামই নেয়ামত। এ ছাড়া অন্যগুলোকে নেয়ামত বলা হয় ভ্রান্ত, না হয় রূপক। উদাহরণতঃ যে পার্থিব সৌভাগ্যের দ্বারা আখেরাতে সহায়তা হয় না, তাকে নেয়ামত বলা নিতান্ত ভুল। অতএব, যে বিষয় পারলৌকিক সৌভাগ্য পর্যন্ত পৌঁছে দেয় কিংবা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাতে সহায়ক হয়, তার নাম নেয়ামত রাখা সঠিক। কেননা, এর কারণে সত্যিকার নেয়ামত লাভ করা যায়। আমরা এসব বিষয়কে কয়েক ভাগে ভাগ করতে পারি। (১) যা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতে উপকারী; যেমন, এলম ও সচ্চরিত্রতা। (২) যা উভয় জগতে অপকারী; যেমন, মূর্খতা ও অসচ্চরিত্রতা। (৩) যা দুনিয়াতে উপকারী কিন্তু আখেরাতে ক্ষতিকর; যেমন কামপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে আনন্দ পাওয়া। (৪) যা দুনিয়াতে ক্ষতিকর এবং আখেরাতে উপকারী; যেমন কামপ্রবৃত্তির মূলোৎপাটন ও তার বিরুদ্ধাচরণ।

এগুলোর মধ্যে প্রথম প্রকারই হচ্ছে সত্যিকার নেয়ামত। কারণ, এটা ইহকাল ও পরকালে উপকারী। আর দ্বিতীয় প্রকার, যা উভয়কালে অপকারী, তা সত্যিকার বিপদ। যা দুনিয়াতে উপকারী ও পরকালে অপকারী, তা অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের মতে একান্ত বিপদ। কিন্তু মূর্খরা একে নেয়ামত মনে করে। এটা এমন, যেমন কোন ক্ষুধাতুর ব্যক্তি বিষ বিশ্রিত মধু পেল। সে বিষ সম্পর্কে অজ্ঞ হলে এই মধুকে নেয়ামত মনে করবে। কিন্তু অসুস্থ হওয়ার পর জানতে পারবে, এটা ছিল তার জন্যে বিপদ। যে বিষয় দুনিয়াতে অপকারী এবং আখেরাতে উপকারী, তা বুদ্ধিমানদের মতে নেয়ামত এবং মূর্খদের মতে বিপদ। এটা তিক্ত ঔষধের মত, যা বর্তমানে বিস্বাদ; কিন্তু পরিণামে উপকারী। অবুঝ বালককে এই

ঔষধ পান করানো হলে সে একে আপদ মনে করে। কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি একে নেয়ামত মনে করে এবং যে এই ঔষধ দেয়, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকে।

এছাড়া দুনিয়ার যাবতীয় বস্তুর ভেতরে ভাল-মন্দ ওতপ্রোতভাবে মিশ্রিত। এমন ভাল বিষয় খুব কম, যা সর্বতোভাবে পূত-পবিত্র। উদাহরণতঃ ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, আত্মীয় -স্বজন। এমন কিছু বিষয়ও আছে, যার ক্ষতি অধিকাংশ লোকের জন্যে উপকারের তুলনায় বেশী; যেমন ধনাঢ্যতা। আবার কিছু বিষয়ের উপকার ও ক্ষতি সমান সমান। এগুলো বিভিন্ন মানুষের জন্যে বিভিন্নরূপ হয়ে থাকে। অনেক সৎলোক ধন-সম্পদ দ্বারা অনেক উপকার লাভ করে এবং আল্লাহর পথে ব্যয় ও খয়রাত করে। এরূপ তাওফীকসহ কেউ এরূপ ধন প্রাপ্ত হলে তা তার জন্যে নেয়ামত বটে। অনেক লোক অল্প ধনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অর্থাৎ সর্বদা তাকে কম মনে করে, আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করে এবং অধিক ধন অনুসন্ধান করে। এ ধরনের ধন তার জন্যে মুসীবত ছাড়া কিছু নয়।

উত্তম বিষয়সমূহের কোন কোনটি সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও পছন্দনীয় হয়ে থাকে; যেমন খোদায়ী দীদারের আনন্দ ও সৌভাগ্য। এরূপ পারলৌকিক সৌভাগ্য কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। এ সৌভাগ্যকে অন্য কোন সৌভাগ্য লাভের উপায় হিসেবে অনুসন্ধান করা হয় না; বরং এটাই সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি প্রার্থিত হয়ে থাকে। কোন কোন উত্তম বিষয় অন্য বিষয় সৃষ্টি করার জন্যে উদ্দিষ্ট হয়, যেমন সোনা-রূপা। সাংসারিক প্রয়োজন সিদ্ধ না হলে সোনা-রূপা ও কংকরের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। যেহেতু এগুলো অনেক আনন্দ লাভের উপায়, তাই মানুষের কাছে এগুলো প্রিয়। তারা এগুলো সঞ্চয় করে পুঁতে রাখে এবং রিয়া সহকারে ব্যয় করে। তারা ক্রমান্বয়ে এগুলোর বেড়াজালে আটকে পড়ে আসল নেয়ামতদাতাকেই ভুলে যায় এবং এগুলোকে মূল উদ্দেশ্য মনে করতে থাকে। এটা মূর্খতা ও পথভ্রষ্টতা।

কোন কোন উত্তম বিষয় সত্তা এবং অপরের উপায় উভয় দিক দিয়ে উদ্দিষ্ট হয়ে থাকে; যেমন সুস্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা। মানুষ আল্লাহর যিকর ও

ফিকরে মশগুল হওয়ার জন্যে এগুলো কামনা করে অথবা পার্থিব আনন্দ পুরাপুরি হাসিল করার উপায় হিসেবে কামনা করে। আবার মাঝে মাঝে সুস্বাস্থ্য সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি কাম্য হয়ে থাকে; যেমন কোন ব্যক্তির পদব্রজে চলার প্রয়োজন না থাকলেও সে পদযুগলের নিরাপত্তা কামনা করে। বর্ণিত তিন প্রকার উত্তম বিষয়ের মধ্যে সত্যিকার নেয়ামত হচ্ছে প্রথম প্রকার; অর্থাৎ, যা সত্তার দিক দিয়ে সরাসরি উদ্দিষ্ট ও প্রিয়। তৃতীয় প্রকারও নেয়ামত কিন্তু প্রথম প্রকারের তুলনায় কম। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার যা কেবল অন্য বিষয়ের উপায় হিসেবেই প্রার্থিত হয়; যেমন সোনা-রূপা, একে খনিজ পদার্থ হওয়ার দিক দিয়ে নেয়ামত বলা যায় না; উপায় ও মাধ্যম হওয়ার দিক দিয়ে বলা যায়। এমতাবস্থায় সোনা-রূপা এমন ব্যক্তির জন্যেই নেয়ামত হবে, যে এগুলো ছাড়া উদ্দেশ্য হাসিল করতে পারে না। যদি তার উদ্দেশ্য জ্ঞানার্জন ও এবাদত হয় এবং জীবন ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র তার কাছে থাকে, তবে তার নিকট সোনা ও মাটির ঢেলার মধ্যে পার্থক্য নেই। সোনা-রূপা থাকার কারণে যদি এবাদতে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়, তবে এবাদতকারীর জন্যে এগুলো নেয়ামত নয়— আপদ।

আল্লাহ তা'আলার নেয়ামত যেমন অসংখ্য ও অগণিত, তেমনি বিরামহীন। তন্মধ্যে সুস্থতা দ্বিতীয় পর্যায়ের একটি নেয়ামত। কিন্তু যেসমস্ত বিষয় দ্বারা এই নেয়ামত পূর্ণ হয়, সেগুলো এখানে পুরাপুরি লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। তবে এর পরিপূরক বিষয়সমূহের মধ্যে আহারও একটি। আহারের নেয়ামত পূর্ণ হওয়ার জন্যে যা যা অত্যাবশ্যক, তার কিয়দংশ এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে। এটা জানা কথা যে, আহার একটি কাজ। এর জন্যে ইচ্ছা এবং ইচ্ছাকৃত বস্তুর জ্ঞান জরুরী। এছাড়া আহারের জন্যে খাদ্য জরুরী এবং খাদ্যের জন্যে খাদ্য অর্জিত হওয়ার স্থান এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী দরকার। আমরা এখানে এসব বিষয় সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করতে চাই।

প্রকাশ থাকে যে, উদ্ভিদ তার মূল শিকড় ও শিরা-উপশিরার মাধ্যমে খাদ্যকে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। খাদ্য শিকড়ে না পৌঁছলে কিংবা শিকড়ের সাথে মিলিত না থাকলে উদ্ভিদ শুকিয়ে যায়। অন্য স্থান থেকে

খাদ্য আহরণের ক্ষমতা তার নেই। কারণ, সে খাদ্যের জ্ঞানও রাখে না এবং খাদ্য পর্যন্ত পৌঁছতেও পারে না। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা মানুষকে এই ক্ষমতা দান করেছেন। সে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে খাদ্য ও খাদ্যের অবস্থান জেনে সে পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এ ছাড়া মানুষকে বিবেকবুদ্ধি দান করা হয়েছে, যা দ্বারা সে খাদ্যের উপকার ও ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হতে পারে। খাদ্য রন্ধন করা ও তার আসবাবপত্র সংগ্রহের কাজেও জ্ঞানবুদ্ধি কাজে লাগে। আহারের প্রতি আগ্রহও একটি বড় নেয়ামত। কেননা, অনেক রোগী খাদ্য দেখে, কিন্তু খায় না। কারণ, তাদের মনে খাদ্যের প্রতি আগ্রহ থাকে না।

এমনিভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এক আহারের ক্ষেত্রেই মানুষকে হাজারো নেয়ামত দান করা হয়েছে। স্বয়ং খাদ্য ও ফল-মূলের সংখ্যা এত বেশী, যা লিখে শেষ করা যায় না।

শোকরে গাফলতির কারণ ঃ মূর্খতা ও গাফলতির কারণে মানুষ নেয়ামতের শোকর করে না। কারণ, সে মূর্খতার কারণে নেয়ামত সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। এটা জানা কথা যে, শোকর আদায় করতে হলে নেয়ামত সম্পর্কিত জ্ঞান থাকা দরকার। যারা নেয়ামত সম্পর্কে জানে, তাদেরও অনেকের ধারণা, মুখে "আলহামদু লিল্লাহ" অথবা "আল্লাহর শোকর" বলাই হচ্ছে নেয়ামতের শোকর। যে নেয়ামত যে রহস্যের জন্যে সৃজিত হয়েছে, তাকে সেই নেয়ামত পূর্ণ করার কাজে ব্যবহার করাই নেয়ামতের অর্থ সেকথাই তারা জানে না। আর নেয়ামতের প্রার্থিত রহস্য হচ্ছে আল্লাহ জাল্লা শানুহুর আনুগত্য। এ দুটি বিষয় জানার পর শোকরের বাধা কামনা-বাসনার প্রাবল্য এবং শয়তানের আধিপত্য ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এখন নেয়ামত জানা থেকে গাফিল থাকার কারণ কয়েকটি। এক, মানুষ মূর্খতাবশত যে বস্তু সকলের কাছে সর্বাবস্থায় বিদ্যমান থাকে, তাকে নেয়ামত মনে করে না। ফলে, কেউ এর শোকর আদায় করে না। উদাহরণতঃ আহার ও খাদ্য সম্পর্কিত যে সকল নেয়ামত উপরে বর্ণিত হয়েছে, কেউ এগুলোর শোকর করে না। কেননা, এগুলো ব্যাপক নেয়ামত। কারও সাথে এগুলোর বিশেষত্ব নেই। অথবা শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে কেউ